অরূপ সাহিত্য সংকলন-১

সুপ্রতীক অরূপ ঘোষ

aroop_g@nauba-aloke-bangla.com
aroop_g@yahoo.com

প্রকাশকঃ www.Nauba-Aloke-Bangla.com
প্রকাশকালঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০০৬
আন্তর্জালে সংযোজনঃ ৩১ শে অগাস্ট, ২০০৭

উৎসর্গ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী

মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার
মাকে মনে পড়ে

মা তোমাকে –

লেখক পরিচিতি

আমি মানসিকভাবে সহস্র বৎসর চলা এক বঙ্গাসন্তান। শারীরিক ভাবে আমি সক্ষম কর্মঠ অর্ধ শতক পার করা এক ভারতবাসী। প্রাচীন ঠিকানা শ্রীহট্ট - বাংলাদেশ। পেশাগত অবস্থান ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী - মুম্বাই। হাল সাকিন প্রাণের শহর - কলকাতা। স্বভাবে দক্ষ ভাবুক। বন্ধু অনেক। এই গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের অবস্থান কিন্তু আমি প্রায় রোজই তাদের সঙ্গে থাকি বা কথা বলে থাকি - ইন্টারনেট আসার অনেক আগে থেকেই। বন্ধুরা বলে কাব্যের ছন্দে পাঠকের হৃদয় হরণ করাই নাকি আমার পেশা। একদম ভুল নয়, কিছুটা ঠিক। মেনে নিই। কারণ বন্ধুরা বলে তো তাই। অবশ্য শুরু থেকেই "পোয়েট্রী ইন কম্যুনিকেশান' এর প্রবক্তা হিসেবে স্বচ্ছন্দ বোধ করি - লিখি বা বক্তব্য রাখি সেই চালচিত্রের ওপর। নাটক করতাম, নাটক লিখিও। বেশিটাই বাণিজ্যিক কাজে বা বিজ্ঞাপনের কাজে লাগে। গল্প কবিতা সবই লিখি যখন যা মন চায়। লেখালেখির সময়কাল দীর্ঘ, প্রায় ত্রিশ বছর তো হবেই বা তার ও বেশী। লেখালেখি করছি ভালো লাগে তাই, আনুষ্ঠানিক প্রকাশের অভিপ্রায়ে নয়। লেখা প্রকাশের সংখ্যাটি তাও নগণ্য নয়। এর কারণ ওই বন্ধুরা।তবে এই নতুন বছর - জানুয়ারী ২০০৭ - শুরু হল আর আমার কলম থেমে গেল। এই কদিন হল আবার শুভ লগ্না কবিতা আমায় টেনে এনে বসিয়েছে - লিখতে হবে - আমার প্রেমের নতুন রূপকে স্বীকার করেছি - তাই আবার লিখছি। সংক্ষেপে আমার পরিচয়ঃ

সাকিন - জগৎপুর পৃথ্বীপুরম অন্তহীন পথ।
প্রথম প্রেম - নাটক। নাটক করতে গিয়ে নাট্য শাস্ত্রে ডুবে থাকা আর সেই থেকে কবিতার সাথে প্রেম।
বিবাহিত কবিতার সাথে। লেখা আমার পেশা।
বিবাহান্তর্গত সম্পর্ক কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সাথে।
ভালবাসি ঘটনার মধ্যে সত্য কে খুঁজতে আর তাকে মনের রসে জারিয়ে নিয়ে বাঁচতে। ভালবাসা কে কাছে টানি স্বার্থের হাত না বাড়িয়ে আর ঘৃণা থেকে দুরে থাকি বা চেষ্টা করি।
বিজীত বন্ধুর নাম সোমরস মিত্র।
স্বপ্ন - সহস্রাধিক শিল্পী সমাগমে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা যার মধ্যে সব রকমের আর্ট ফর্ম এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে - যা সারা পৃথিবীতে চলবে আর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে রেপার্টরী থিয়েটারের উপমা হিসেবে - মানব কর্তৃক সহস্র আলোকবর্ষ ভ্রমণের যে সময় প্রয়োজন সেই সময়ের দৌড় অতিক্রান্ত হয়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে রইবে সেই নাটক।
রসদ - একাগ্রতা।
আসক্তি - সীমাহীন গতি।
ভাবে - ধূমকেতু।

১. কেন লিখি, কিভাবে লিখি, কার জন্য লিখি?
:লিখতে ভালো লাগে তাই আমি লিখি । কিভাবে লিখি তা আমি নিজেও জানি না। লেখা হয়ে যায়। কারো জন্য বিশেষ ভাবে লিখি না, তবে বিশেষ কেউ আছেন যিনি না থাকলে আমার লেখা হয় না। কিছু লেখার প্রেরণা আমার ঘরের চৌকাঠ থেকে আসে বা আমার একান্ত গৃহকোণে লুকোনো পিঁপড়েদের কাছ থেকে।

২. সেই বিশেষ জনাটি কে?

:ইশ্বর এবং তাঁর প্রদত্ত অসীম কৃপা। আমার "হে ঈশ্বর' কবিতাটিতে যেমন আমি লিখেছিলামঃ

দুয়ারে দাড়ায়ে ওই হাসি মুখ
মোর এতো কাছে আজ সুখ
কে জান? সে তুমি
গোধূলির দিগন্ত পারে
দূরে অতি দূরে
শ্যামলিম কোন মেদুর সুদূরে
চিনে নিই আমি পরাণ বঁধুরে
সেই বা কে জানো? সে তুমি

তুমি তুমি তুমি হে অন্তর্যামী
গভীর নিশীথে ঝিঁঝিঁ'র ডাকে
মন যখন একা শঙ্কায় কাঁপে
তখন কে আসে মনে, জানো?
বিস্ফারিত চোখের তারায় সেও তুমি

৩. প্রিয় কবি, লেখক এবং তাঁদের লেখা ---

: প্রিয় কবি বা লেখকের নাম বলে শেষ করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করতে পারি কিন্তু ভালো লাগার শেষ আছে নাকি? তাই বুঝি ঠিক বলতে পারবো না সবার নাম। আন্তর্জালের পাতায় পাতায় নতুন অনেক কবি আছেন যাঁরা বেশ সম্ভবনাময় - তাদের জন্য আমার অশেষ ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

৪. সাহিত্যের উপর ইন্টারনেটের প্রভাব–

: প্রভাব অসামান্য। যত এর সান্নিধ্যে আসব ততই জানব। কিন্তু মৌলিক কিছু সৃষ্টি তখনই হবে যখন পড়ালেখার প্রক্রিয়াটি হবে পদ্ধতিগত। যে কোন সৃষ্টিই কঠিন, তাই তার জন্য সাধনাও কঠিন এবং তার প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে আসামান্য। এ'গুলো যদি তত্ত্ব মনে হয় তবে বলি ইন্টারনেট এর প্রগতিশীল সুপ্রয়োগ আর নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করা ঠিক একই রকম। দু'য়েই একশ শতাংশ সততার প্রয়োজন।

৫. বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত –

: আমি খুবই আশাবাদী। ভাষায় আমরা সমৃদ্ধ, তাই এর চর্চায় ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার আরো পরিপূর্ণ হবে। দুই বাংলা এখনও আলাদা ভাবে একই ভাষার চর্চা করে এর থেকে বড় লজ্জা বুঝি আর নেই। রাজনীতিকদের সন্মেলন হয় - সার্ক - বার্ক কবে থেকে শুরু হবে? বার্কটা কি? পাঠক বুঝে নিন। বাংলা ভাষায় অর্ক দেব যেদিন ঢাকা আর কলকাতায় একই সাথে উদিত হবেন সেদিন বার্ক এর জন্ম হবে। এর বেশি বললে ভাবনা চিন্তার গন্ডি টানা হয়ে যাবে যা আমি করতে চাইনা।

৬. সাহিত্যের দায়বদ্ধতা–

: সাহিত্য জীবনের কথা বলবে, যা থেকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে শিখবো । সাহিত্য কল্পনার কথাও বলবে, যা থেকে আরেকটু বেশি কল্পনা মেখে অবগাহন করবো সৃষ্টির রূপসাগরে। যেখানে কল্পনা নেই সেখানে সৃষ্টি নেই আর যেখানে সৃষ্টি নেই সেখানে যে জীবন নেই। আছে কি?

৭. বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজেকে কিভাবে দেখতে চাই?

:ওরা আমার লেখা মনে রাখুক তা হয়তো বেশী চাওয়া হয়ে যাবে - চাই অন্তত পড়ুক আমার লেখা। ভাল না লাগলে বলুক যা বলতে চায় পাঠক। কিন্তু না পড়ে যেন কেউ মতামত না দেন।

আমার 'হারিয়ে' কবিতাটির শেষ ক'টা লাইন মনে পড়ে গেলঃ

একদিন যেও না হারিয়ে
জোনাকীর আলো জ্বালিয়ে
কাউকে না বলে চুপ করে
বুড়ি চাঁদ তখনও আছে উঠোন জুড়ে
মনের আকাশটাকে কে রেখেছে আধাঁরে মুড়ে
হারাতে চাই নি কিন্তু হারাতে যে হবে
কবিকে মনে রাখে কে কোথা কবে

৮. আমার স্বপ্ন ---

: আবার আসিবো ফিরে---- এই একই জন্মভূমিতে, একই বাবা মায়ের কোলে । আর কোথাও নয়, আর কারো কাছে নয় ।

৯. সম্প্রতি লেখা কবিতার কয়েকটি লাইন –

'কষ্টপুরে কবি একা' কবিতার কিছু লাইনঃ

কবিতা চলে গেছে সুদূর অতীতে
লেখা ছেড়ে গেছে কিছু দীর্ঘশ্বাস
আয়না গম্ভীর মুখে এসে বলল - আমি যাই?
চঞ্চলা কলম কতদিন স্নান করেনি
গায়ে মেখে বসে আছে ধুলো, কাদা, ছাই!

সকাল গড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে এল রাত্রি
সকালতো হয়না, কবি কি আঁধারের যাত্রি?
কবিতা গেছে চলে, লেখাও তাই
মুখ দেখবে কবি, সে আয়নাও নাই
কবির শ্বাস ফুলছে, দম বন্ধ প্রায়
এত কষ্ট কেন, বিধির কি অভিপ্রায়!

এই লেখা দিয়ে শেষ করলে মনে হবে একজন ফ্রাস্ট্রেটেড কবির নাকাম কলম কি লিখেছে! তাই বলিঃ

সেই বনমাঝে বকুল বীথির তলে
সেই দিঘি পারে সজল কাল জলে
সেই মাঠ পার করে গলায় মেঘমল্লার
সেই দিগন্তে আমি একা তবু তোমার
গোধূলি বেলায় তোমার কণ্ঠে মিঁয়া কি টোড়ি

চুপি চুপি এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরি
তুমি যে আছ শয়নে স্বপনে জাগরণে
তুমি যে আমার প্রেম তব রস আহরণে
কবিতা আমার প্রেম লেখা আমার পেশা
মোর কলমে কালি ভরে রেখ হে চির নেশা

এখনও আছেন? তাহলে আবার আসবেন এই পাতায় –
আপনিও লিখুন না আপনার ডায়েরী বা হিসেবি খাতার পাতায়!

মুম্বাই, জুন ১৩, ২০০৭

সূচীপত্র

কবিতা ৮
জীবন ভিত্তিক ৮
নাচ ৮
আর কাঁদিওনা ৯
স্বপ্ন ১০
ভবানীপুরের ফুটপাথে ১১
প্রেম ১২
দিঠি ১২
যাবে? ১৩
রজত জয়ন্তী ১৪
বিরহ ১৫
হারিয়ে ১৫
দেশপ্রেম ১৬
মাকে ৭৮৬ থেকে ১৬
রম্য কবিতা ১৭
ক্রেতা ১৭
গল্প ১৮
সম্পৃক্তি ১৮
মিকুর উনিশে সেপ্টেম্বর ২৪
রম্য রচনা ২৭
মাকড়সার জাল ২৭
সংরক্ষণ ২৮
জীবনী ৩০
ভাল থাকুন হৃষিদা ৩০
প্রবন্ধ ৩১
আমি শিখেছি ৩১
ব্রাত্য চিন্তায় যুক্তি বোধ ৩৬
স্বদেহ মনের ঘরে প্রেমের বাসা ৩৯
মুখ্যমন্ত্রী শুনছেন কি? ৪১
বন্দেঃ মাতরম এর ওপর ফতোয়া ৪৪
কয়ামৎ সে কয়ামৎ ৪৬

কবিতা
জীবন ভিত্তিক

নাচ

একটা ছড়া বলি শোন
দাঁড়াও একটু শোনোনি কখনো
নামতা পড়া জীবনে
এর নেই কোন মানে
নাচ ছিল একদিন তার সাধনা
আজ আর নাচ স্বপ্নেও আসেনা
মনটাকে নাচিয়ে তাধিন তাধিন
হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া একদিন
বেশ লাগবে কিন্তু তখন যদি বৃষ্টি পড়ে
প্রাণ খুলে নেচে ওঠা ভেজা ঘাসের ওপরে
তাধিন তাধিন প্রাণ খুলে বাঁচা
আজ শুধু মন প্রাণ সত্তা উজাড় করে নাচা
বৃষ্টি জল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল পায়ের তলায়
নাচছে মন নাচছে প্রাণ অশান্ত এই পায়ের পাতায়
আবার নাচবে সেই তাপসী আপন তালে ও লয়ে
জমা হবে না পাওয়া সুখ মনের নিলয়ে

১৭ই মে ২০০৬
মুম্বাই

সূচীপত্র

আর কাঁদিওনা

তার কান্না দেখে তোমার খুশি খুশি লাগে
তাই তার কান্না তুমি পেলেনা যে দেখতে
অনেক কষ্ট দিলে তাকে, সে নিল, সে দিলোনা
তোমায় দেখতে তার চোখের কোনায় ফেটে পড়া লোনা
আচ্ছা কাঁদাও কেন, ভাল লাগে?
হাসাতে পারোনা, ভোগ দুঃখবাদে
কান্নার ফিক্সড ডিপোসিট কোরে
তার সুদটা কষ্টের সেভিংসে ভরে
বিরাট ব্যাপারী, আপাতঃ সুখী তুমি একদিন একা হয়ে যাবে
কাঁদতে চাইবে তুমি, তখন তোমার কান্না কে শুনবে এ'ভবে
কাঁদিওনা আর কাউকে
থামো এবার বাঁচাও নিজেকে
এখন ও আছে সময়
ফিরে এস জীবনের আঙ্গিনায়
হাস, হাসাও আর হাসতে থাক
জীবনকে ভাল বাসতে থাক

কলকাতা
জুন ১৮, ২০০৬

সূচীপত্র

স্বপ্ন

ভয় পাওয়ার দৈনন্দিন অভ্যেসের মাঝে
একটু শানানো সঙিনের মত ঝলসে ওঠার সাধ
শান্তির এত অপচয় কেন
কেন এত শঙ্কা সবার মনে
কেন রোজ নিরীহ মানুষ মরে
মৃত্যুর কারবারীরা লাইনটা চেঞ্জ করেনা কেন
আরে বাবা ব্যবসা করবি তো বলনা, উপায় আছে
মানুষকে মানুষ করে তোলার বাণিজ্য কর
শোনরে পাজীগুলো তাতে সবার ভাল হবে
নিজের বিড়বিড়ানি শুনতে পাচ্ছিলাম
আর নিজেকে নতুন করে খুঁজে নিচ্ছিলাম
মাত্রা ছাড়া দুঃসাহসী হব আমি
জ্বলব সর্বাঙ্গে, যন্ত্রণাকে চুমুকে পান করব
ভেতরের সব তুঁতে নীল জ্বালাকে
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় করে নেব
ব্যথাহীন গলা দিয়ে তাদের নাবিয়ে দেব
তখন সর্বৈব শান্তি সুখ আনবে এক স্থীতিশীলতা
ঘোড় দৌড়ের মাঠগুলোতে লাফিং ক্লাব খুলব
রোজকার সব কাজ হবে, বেনিয়া বন্ধনে নয়
চাই স্বাধীনতা, প্রশান্তি আর শিথিলতা
মাত্রা ছাড়া বেহিসেবী হব আমি
শিশুদের সাথে, ফুলের মাঝে, পাখীদের কাছে
আমি ওদের সাথী হব, বল্গাহীন গতায়াত হবে আমার
আমি সর্বত্র সবার কাছে গিয়ে জানতে চাইব
ভাল আছ তো? কি কষ্ট তোমার? নেই কিছু?
এই তো চাই শুনতে, বল বল আরেক বার বল
আমি ভিসুভিয়াসের ধোঁয়ার টুঁটি চিপে ধরে
পৃথিবীকে সুস্থ সুকোমল সমীরে স্নান করাব
আমি লাদেনকে বোঝাব কিন্তু বুশ পাজিকে
কিছুতেই নিউক্লিয়ার বোমা বেচতে দেবনা
যাচ্চলে, ডাকলে কেন? ধুর, তুমি না পারও মা
আমি যে এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস হতে দেবনা।

মুম্বাই
সেপ্টেম্বর ১৬, ২০০৬

সূচীপত্র

ভবানীপুরের ফুটপাথে

রাত কত হলো? উত্তর মেলেনা
চোখ মেলে দেখে সে, দর্শন মেলেনা
কালো কালো আকাশ মিশমিশে অন্ধকার
চিৎ হয়ে পড়ে আছে, একটু আলো দরকার
ফুট পাথে শুয়ে সারাটা দিন গেল
কত উঁচু নিচু দু' পেয়ের সাথে দেখা হলো
খেলা হলো , হেলা হলো, মেলা ও শেষ
আহত পথ পাশে ব্যথা ও অশেষ
এই খোলা আকাশটা ও যেন কেমন
এ' সময়ে কেউ মুখ কালো করে!
একা অনেক যন্ত্রণা নিয়ে আছে সে পড়ে
দিন শেষ হলো, সব পাখি ঘরে গেল
ডানা ধোয়া আলো ফেলে রেখে গেল
তার মুখের ওপর এক চাদর বিছিয়ে
শরীর কাল হলো যন্ত্রণায় বিষিয়ে
রাত কত হলো? উত্তর মেলেনা
তারিখ বদলে গেল সকাল তো এল না!

১৮ই মে, ২০০৬

সূচীপত্র

দিঠি

মনের ব্যথা তুমি সখা
গায়ের ব্যথা যাচ্ছেনা
একলা আমি একলা তুমি
কাঁপছে জ্বর কাঁপছে ভুমি

চাতক পাখীর টিটি রব
বৃষ্টি নামুক এখন সব
আঁজলা ভরে আনলে জল
খরার তাতে কিই বা ফল

শুকনো ঘাসে আগুন দিলে
লেলিহান শিখা না নেবালে
এমনি করেই চলবে কি
উষ্ণ প্রতীক্ষা রয়েছে বাকী

তোমার জীবন আমার মাতন
আমার জীবন তোমার মাতন

তোমার কথা আমার কথা
দুঃখের কথা সুখের বাসায়

সুখের কথা দুঃখের আশায়
সুখের আসা আলোর কাছে
চোখের তারায় জীবন বাঁচে
তোমার গান আমার গান

দূরের তারা দীপ্যমান
ঝর্ণা ধারা সাবলীল
তোমার হাসি অনাবিল
তুমি ছাড়া জীবন মাটি

চোখের ভাষা হল দিঠি
হরিণী তুমি ছন্দিলা সিতি
তোমার দিঠিতে আমার ইতি।

মুম্বাই
সেপ্টেম্বর, ২১, ২০০৬

সূচীপত্র

যাবে?

যাবে? চলে যাবে?
একটা ছড়া বলি শোন
এটা তুমি শোননি কখনও
দাঁড়াও একটু, না হয় পা চালিয়েই যাবে
তুমি যাবে, তো কে তোমায় থামাবে
তুমি তো জেদের বাসা
তুমি এক না পাওয়া ভালবাসা
এমন ছড়া শোনোনি কখনও
নামতা পড়া জীবনের হেঁসেলে
এর নেই কোনও মানে
নৃত্য ছিল একদিন তোমার সাধনা
আজ নৃত্য তোমার স্বপ্নেও আসেনা
কষ্ট পেলে? বা দুঃখ?
না হয় পেলেই
সুখ তুমি চাইতে পার
দুঃখ অত সহজে মেলেনা
চাইবাসার ঘরটা আমাদের খুব সুখের ছিল
দুর, কেবল চাই চাই করেই আমি বাসা হারিয়েছি
যাবার আগে তোমায় বলি
আমি কিন্তু তেমন ডাকাতই আছি
মুহুর্মুহু ডাকাতি, যেওনা এখুনি চলে
মনটাকে নাচিয়ে তা ধিন তা ধিন
হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া একদিন
বেতলার জঙ্গলে
চলনা আবার যাই
আবার যৌবনের ভেলা ভাসাই
শরীরে বাঁক নিয়ে তির্যক হাসি তোমার চোখের কোনে
আমার মনের কালবৈশাখী তোমার মুদ্রাহেলনে শ্লথ
চলনা মনটাকে নাচিয়ে তা ধিন তা ধিন
ঝপাং করে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া একদিন
তোমার করপুটে আমার গরম হাতের তালু
বেশ লাগবে কিন্তু তখন যদি বৃষ্টি পড়ে
পাকা লেবু আর কাজল কালো শীফন
তোমায় আষ্টেপৃষ্ঠেজড়িয়ে ধরে
প্রাণ খুলে নেচে ওঠা, ভেজা ঘাসের ওপরে
তাধিন তাধিন প্রাণ খুলে বাঁচা
শুধু মন প্রাণ স্বত্বা উজাড় করে নাচা
বৃষ্টির জল ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল পায়ের তলায়
নাচছে মন, নাচছে প্রাণ ছন্দময়ীর পায়ের পাতায়
কি হলো? চলে গেলে?
বেশ। উঠোনে আবছা আলতার দাগ রেখে গেলে।

সূচীপত্র

রজত জয়ন্তী

যৌবনের ময়দানে পা রাখতে না রাখতেই
নজর কেড়ে ছিল তার আজানু লম্বিত বেণি
কি করি আর না করি
সকাল বিকেল মরি
মনকে নিংড়ে নিয়েছিল সেই
ভাল বেসে ছিল প্রথম দরশনেই
উজাড় করে দিয়ে ছিল প্রথম মিলনেই
সবুজ দ্বীপের কালো আখিঁ
মন বলত গাও পাখি
আকাশ কে গায়ে মাখি
ভাবি আর বসে থাকি
প্রাণ বলে হেসে বাঁচি
এই বলে লম্বা বেণি হল সাথী
পঁচিশ বছর পর আজ ও সে সুন্দর
নেই সে লম্বা বেণি আছে তার কদর
এখন আমরা ভাল বন্ধু ও সাথী
এক সাথে গাই নতুন প্রভাতি।

মে ১৬, ২০০৬

সূচীপত্র

হারিয়ে

এক দিন যেও না হারিয়ে
কালিঘাটের গঙ্গা পেরিয়ে
একদিন যেও না হারিয়ে
ট্রাম লাইনটা পেরিয়ে
একদিন যেও না হারিয়ে সব ফেলে রেখে
যেদিন সবাই কাহিল তোমায় ডেকে ডেকে
একদিন ভুলে যেও যে তুমি এসেছিলে
সেদিন আশাকে দিও ভাসিয়ে গঙ্গাজলে
একদিন যেও না হারিয়ে
হাট বাট মাঠ পেরিয়ে
গোয়াল ঘরের ধুনোর ধোঁয়া পুড়িয়ে
একদিন যেও না হারিয়ে
জোনাকীর আলো জ্বালিয়ে
কাউকে না বলে চুপ করে
বুড়ি চাঁদ তখনও আছে উঠোন জুড়ে
মনের আকাশটাকে কে রেখেছে আধাঁরে মুড়ে
হারাতে চাই নি কিন্তু হারাতে যে হবে
কবিকে মনে রাখে কে কোথা কবে
আমি যাই, তুমি থাক, আমি যাই হারিয়ে
একদিন যেও না হারিয়ে
তাল গাছের আকাশ ছাড়িয়ে
এসো তুমি যদি চাও কবিতার ছায়া মাড়িয়ে
একদিন যেও না হারিয়ে
দুঃস্বপ্নের রাতটা পেরিয়ে।

১৩ই জুন, ২০০৬
মুম্বাই

সূচীপত্র

মাকে ৭৮৬ থেকে

রুদ্ধ আজ আমার মন পাখীদের গান গাওয়া
শুষ্ক কণ্ঠ, শ্রান্ত শরীর এবার কুলায় ফেরা
অসহ্য এই, শানানো নৈশব্দে সকালকে যেন কেমন লাগছে
তোমার দেখা নাই, বোধহীন আমি, বুঝিনা ঠিক কেমন লাগছে

হাসি খুশী পল্লবিত ফুলের পাপড়ি গুলি আজ চোখ বুজেছে
তুমি কোথায়, এস সত্বর, অসাড় আমি, জানিনা কেমন লাগছে।
রোজ তোমার যে কল্লোলিনী ঝরণায় আমি হই পবিত্র, সুস্নাত
আজ কি হোয়েছে তোমার, সুখনো কেন তোমার ঝরণা এত

তুমি কেন দূরে প্রাণ, এস একটু পা চালিয়ে আর দেরি কোরনা তুমি
আমার অসাড় অঙ্গাবিতানে তোমার ছোঁওয়া পাব বলে আছি বসে আমি
শীতের পাহাড়ের হৃদপিন্ডের ধুকপুকুনি কি থেমে গেল, না বোধ হয়!
এখনও তোমার দেখা নাই, ফুসফুসে শ্বাস আর চলেনা, থামল মনে হয়।

আমার চোখে আগুন, অবিরত গোলাবারুদের গন্ধ গত চারদিন
আমার হাতের সচল আঙ্গুল গুলো অকাতরে দিয়ে যায় মৃত্যু ভেট
তাদের, যারা এসেছিল আমার মায়ের গায়ে হাত দিতে, শালা ঘুস্পেট
ওদের আমি একটাকেও ছাড়িনি, ওদের আমি মারিনি, ওরা মরেছে
ওরা শেষ, আমি ও, ওরা ওদের প্রাপ্য কর্মফল ভোগ করেছে, করছে

তুমি কোথায় জীবন, তোমার দেখা নাই কেন, আমি যে আর পারিনা
এ'কথা ভাবাও পাপ, তাই শেষ পর্যন্ত শ্বাস নেওয়া আমি ছাড়ি না
তোমার সদ্য স্নাতা আকাশে জবাকুসুমের রং আমায় টানে
তুমি কোথায় এস তাড়াতাড়ি, আমায় যেতে হবে আন্দামানে

সেই কবে ডিগলিপুরের গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই
ফিরতে হবে, অন্তত একবার, মাকে কথা দিয়ে ছিলাম, ভুলিনি
তুমি কোথা হে ঈশ্বর, এস সত্বর, আমি ডুবে যাচ্ছি অন্ধকারে
আমার আঙ্গুলে অবিরত আগুনের দিশা দৃষ্টি ঘোলাটে এবারে

চার দিন ধরে শত্রু নিধন করেছি, শ্বাস নিয়েছি মাইনাস চল্লিশের তাপাঙ্কে
আমার শরীর বরফে মোড়া, ওদের স্পর্ধা! ওরা এসেছিল ছুঁতে আমার মাকে!
এসেছে, এসেছে, এসেছে ওই শোনা যায় চপারের হুঙ্কার আর কড়কড়ানি
এসে গেছে মায়ের আরেক সন্তান, আমি নিথর হলাম, গান গাও ঘুমপাড়ানি
কেঁদোনা মা, আমি আসি, তুমি নিরাপদ আজ আমার ঠিকানা শূন্য সাতশো ছিয়াশি
আর কারগিল হবেনা মা, দুর্বৃত্তেরা জানে আমরা, তোমার সন্তানেরা, এখন আরও সতর্ক আছি।

মুম্বাই
সেপ্টেম্বর, ১২, ২০০৬

সূচীপত্র

ক্রেতা

বিজ্ঞাপণাজ্ঞোর কবিতা-পড়ুন ও একটু ভাবুন কিছু করার সত্যি কোন ও ইচ্ছা আছে কি আপনার মধ্যে-যদি থাকে ভাল তবে-পড়ুন

প্রবুদ্ধ জ্ঞানীরা দয়া করে পড়বেন না এই লেখা

লেখা পড়া শিখে কি করবে ভেবেছ?
স্নাতোকত্তর হয়নি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছ?
গ্র্যাজুয়েশন হয়নি, মাঝ পথে থেমেছে চাকা
সামনে অন্ধকার, সব কেমন লাগে ফাঁকা?
কি করবে জাননা - শুধু 'কর্মখালি' দেখ?
তার থেকে বরং সঠিক পথে বেচা শেখ।
বেচবে তুমি, তোমার কথা শুনবে সবাই
যদি বলতে ও গুছিয়ে বোঝাতে পার ভাই
অলৌকিক নয়, জীবনে সত্যিই কিছু করে দেখান যায়
যদি লোকে বুঝতে পারে তোমায়, তোমার থেকে কিনতে চায়
নারী হও বা পুরুষ, ঈশ্বর বাবুর বাজারে এসে
হতাশ হোয়ে, হেরে গিয়ে যেওনা মাঝ পথে বসে
এই বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা আমরা সবাই
কারণ আমরা যে সবাই বেচতে চাই।

এই প্রগতিশীল পৃথিবী ধ্বংস হবে কবে?
যেদিন বিক্রীর পেশা আর থাকবে না।

এর পর জানতে হোলে স্বেছায় যোগযোগ করে দেখতে হবে
কি এর মানে, কি ঘটতে চলেছে - কখন, কোথায় ও কবে!!!

প্রোয়েক্সেলেন্স ইঙ্করপোরেটেড
ই-মেইল - argee31@hotmail.com
গতিময় দূরভাষঃ +৯১ ৯৮১৯৬৮৪২৭৯

সূচীপত্র

গল্প

সম্পৃক্তি

এ গল্পের আজ হলো ২৫ শে ডিসেম্বর। ২০০৪।

রাত সাড়ে নটা। চেন্নাই এগমোর ষ্টেশনে ব্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে চড়েই বিকাশ হাসপাপি জুতোটা খুলে একটু পা ছড়িয়ে বসল ওর ফার্স্ট এসি কম্পার্টমেন্টের লোয়ার বার্থের ওপর। ট্রেন ছাড়তে এখনও মিনিট কুড়ি দেরি। পরনে এখনও ধরাচুড়ো। স্যুট পরেছিল আজ বিকাশ। নতুন প্রোমশানের খবর আজ ওদের গ্লোবাল সি-এমডি মিষ্টার ওয়াটসন তাজ করমন্ডলের ব্যাঙ্কয়েট হলে স্বয়ং দিলেন। সেই কবে এক সেলসম্যানের চাকরী নিয়ে জীবন শুরু করেছিল বিকাশ! গোদা বাংলায় বেচুবাবু। আজ আর ভাল করে মনেও পড়েনা। বিকাশের বয়স এখন চল্লিশের গোড়ার দিকে। চির অচেনা এক তীব্রতার সাথে ছুটে চলেছে বিকাশ! কেন? নিজের মনেই হাসে। মনে মনে ভাবে একবার কুমীরের পিঠে চড়লে নামা খুব শক্ত। কিন্তু কুমীরের পিঠের ওপর বিকাশ চড়তে চায়নি। রোজ নতুন রণনীতি নিয়ে ভাব। নিজে ছোট, অপরকে ছোটাও। আবার ভাব। ভাবা থামিয়েছ কি তুমি শেষ! রোজ পায়ের তলার জমিটাকে আরও শক্ত কর। তার পরেও পড়ে গিয়ে উঠে পড়ার জন্য তৈরী থাক। ওর ভাল লাগতো না এই দৌড় কিন্তু এখন দৌড়টা প্রায় জৈবিক অভ্যাসের মত হয়ে গেছে। ১৯৯২ পর্যন্ত মালটিন্যাশনাল কোম্পানী পি এন্ড জি'র পূর্ব ভারতের প্রধান হয়ে বেশ ভালই ছিল। এই অবধি উঠে আসার পথে অনেক পরিশ্রম করেছে অনেক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে বিকাশ। তাই ভেবেছিল বাকি জীবনটা ডালে-দুধে-ভাতে কাটিয়ে দেবে। তা হয়নি। পি এন্ড জি। সারা পৃথিবী জোড়া নাম ওদের কোম্পানীর। এই কোম্পানীতেই একদিন শুরু করেছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। মনে আছে গৌহাটির পানবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান - ভিক্স কি গোলি লো খিঁচ খিঁচ দূর করো - গেয়ে ট্রেনিং শুরু। তার পর থেকে বিকাশ বেচে চলেছে। তাই কি? তার আগেও কি বেচতে হতনা? রোজই তো ঘরে বাইরে কিছু না কিছু বেচতে হয়, সবাইকেই। বেচা বন্ধ হলে তো জীবন থেমে যাবে! সে নিজে কত সৎ, না চাইলেও সেই অরাকেও বেচতে হয়। কিছু না বলেও তো বেচা যায়।

১২ বছরের ওপর হলো, নিজেকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে, আরও উন্নতি করার নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। এই নেশার শুরু ১৯৯২ এর ২৯শে জানুয়ারীর রাত থেকে। তার তিন দিন আগে ২৬শে জানুয়ারী'র রাতে বিকাশের জীবনের ট্রেন ডিরেইলড হয়ে গিয়েছিল। দীপা ওর কাছে ডিভোর্স চেয়েছিল সে'রাতে। কারণ? ঠিক কি কারণ ছিল সেটা ওর কাছে আজও পরিষ্কার নয়। তবে সেটা নিয়ে আজ আর বিকাশ ভাবতে চায়না। আজও দীপা আছে। আজও সে ওর স্ত্রী। বিকাশ যেন মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়েছিল। দীপা হঠাৎই একটা লম্বা অভিযোগের ফর্দ পেশ করেছিল - "তুমি কেমন স্থানু হয়ে গেছ। তোমাকে নিয়ে আমার কোনও অহঙ্কার নেই। তুমি কেমন যেন অল্পেতে সন্তুষ্ট টাইপ"। বিকাশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। পারল না। মাঝে মাঝে দীপা যখন বলে তখন সবাই শোনে। মানে বলার কোনও উপায় থাকেনা। বিকাশ খুব ভদ্র। এই জায়গাটা শুরু থেকেই

দীপাকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রয়োজনে বিকাশ যে কি কঠোর ভাবে কথা বলতে পারে সেটা দীপা জানে! তবু দীপা বলেই চলে - "তুমি না গড়েছ নিজের কেরিয়ার না আমাকে গড়তে দিয়েছ আমার কেরিয়ার। আমরা বরং আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে নিই। পড়াশোনাটাও করনি ঠিক করে যে জীবনে আরও ওপরে উঠবে! শুধু বি এ পাশ করে কি আর এর বেশি যাওয়া যায় বিকাশ? তুমি পারবেনা। তুমি হারছ, হেরে চলেছ আর আমাকেও তোমার পরাজয়ের ভাগীদার বানিয়েছ"! তার পর আর কোনও কথা শোনার জন্যে দীপা দাঁড়ায়নি। বিচারের বাণী শুনিয়ে স্বাভাবিক কাজে ফিরে গিয়েছিল দীপা। আর বাকহীন বিকাশের তিনটে দিন কোথা দিয়ে বয়ে চলে গিয়েছিল তা এখনও বোধের বাইরে। বিকাশ হতভম্ব! এ'রকম ফ্রেঞ্জি দীপাকে আগেও কখনও দেখেনি বিকাশ। এই প্রসঙ্গে মানে ওদের কেরিয়ার প্রগ্রেস নিয়ে আগেও কথা হয়েছে কিন্তু তার থেকে ডিভোর্স! তা ছাড়া বিকাশ উন্নতি যে করেনি তা'তো নয়। এটা ঠিক যে বিকাশ গত বছর আরেকটা প্রোমোশান রিফিউস করেছিল। কারণ ও কলকাতা ছেড়ে যেতে চায়নি। ঘরেই থাকতে চেয়েছিল। মাসে অন্ততঃ পনেরো দিন রাতে নিজের বাড়িতে ঘুমোতে চায় বিকাশ। কেরিয়ারের জন্য সব ছেড়ে দিয়ে বাইরে পড়ে থাকাটা বিকাশের খুবই অপছন্দ ছিল।। কিন্তু বিকাশ বুঝতে পারছিল, ওদের বিয়ের আট বছর পরেও, দীপার মায়ের ইচ্ছা পূরণের গল্প লেখা আজও শেষ হয়নি। যাদবপুরের স্কলার ইলেক্ট্রনিক্স এঞ্জিনিয়ার মেয়ের স্বামী কিনা বিএ পাশ এক বেচু! যদিও বিকাশ তখন কর্পোরেট সিঁড়ির বেশ ওপরে উঠে এসেছে। দীপার মা চাইতেন মেয়ের বিয়ে হবে কোনও বড় ডাক্তারের সাথে। সেদিনও ভাবতেন তিনি আবার মেয়ের বিয়ে দেবেন! দীপা প্রথম প্রথম মা'র এই সব ভাবনাকে আমল দিতনা। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের কথার প্রচ্ছন্ন সমর্থন করে বসত আবার তার পরে এসে বিকাশের সাথে প্যাচ আপ করে নিত ওর মিষ্টি হাসি আর আগুন ধরানো চুমু দিয়ে। বিকাশ সেই আগুনে পুড়ে দীপাকে পৌঁছে দিত চূড়ান্ত সুখসীমায় বা তারও বাইরে।

জীবনের গাড়ী চলছিল বেশ। ঝগড়া ছাড়াই দাম্পত্য সুখ। দুজনে মিলে যেত একসাথে সুখবৃষ্টিতে ভিজে। দীপা বলত - ডাকাত একটা। ওদের মধ্যে একটা কেমিস্ট্রী আছে। দীপা যে ঠিক এই জায়গায় চলে যাবে সেটা বিকাশ বোঝেনি। ওর কল্পনার বাইরে দীপা ওকে এত বড় ধাক্কা দিতে পারল? বিকাশ ভেবে চলে। দীপা অন্য কারও প্রেমে পড়েছে বলেও মানতে রাজী নয় বিকাশ। সারাদিন দীপার ঘরের দিকেই মন। অফিসেও দীপা কোনও বাড়তি সময় দেয়না। দীপা পুরোপুরি ঘরোয়া এক কেরিয়ার উওম্যান। দীপা কেন এমন করছে!

বড় যন্ত্রণায় ছিল বিকাশ সেই তিন দিন তিন রাত। বিকাশ মনে মনে ঠিক করে ফেলল। দীপাকে আর কোনও কথা বলবেনা। বিকাশ দীপাকে একটু বেশীই ভালবাসে। সেই ভালবাসা একমুখী। কিন্তু সেই ভালবাসা বিকাশের মেরুদন্ডহীনতার প্রকাশ নয়। বিকাশ নিজেই নিজের জীবনটা তৈরী করেছে। নিজেকে গড়েছে, ভেঙ্গেছে আবার গড়েছে। দীপার এই পাগলামীকে বিকাশ আর প্রশ্রয় দেবেনা। দীপা জানে যে বিকাশ ওর আলুথালু ভাবনার স্প্রিং বোর্ড। সেটা এর আগেও বেশ কয়েক বার দীপা প্রমাণ দিয়েছে। দীপা যে কেন মাঝে মাঝে সব গুলিয়ে ফেলে বিকাশ সেটা বোঝার চেষ্টা করে এসেছে এতদিন। বিকাশ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ২৯শে জানুয়ারীর বিকেলে। দীপার এই সারমনাইজেশনকে পাত্তা দেওয়া একদম বন্ধ করে দেবে বলে ঠিক করেছিল বিকাশ।

২৯ তারিখ বিকেলে দীপার মা এসে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন এমন ভাবে যেন কিছুই জানেন না। বিকাশ খুব রেগে গিয়েছিল। অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বলে ছিল - দেখুন এটা আমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার, আপনি এর মধ্যে না এলেই ভাল হয়। আর যদি পেছনে মতামত দেন সেটা যেন আমার কানে না আসে। হয় মেয়ের আবার বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখা ছাড়ুন আর নয়ত কাগজ পত্র তৈরী করে নিয়ে আসুন সই করে দেব; কিন্তু কোনও নাটক করার চেষ্টা করবেন না। এই কথাগুলোকে অনুরোধ বা ঔদ্ধত্য বা দুইই মনে করতে পারেন। জীবনে কাউকে এভাবে অপমান করেনি বিকাশ এর আগে। আজ করল এবং বেশ সচেতন ভাবেই। বিকাশ শিখেছে কি করে রাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হয় আর কি করে রাগের স্বীকার হওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। আগে প্রায়ই রেগে যেত বিকাশ। আজ সে শান্ত থেকেই রাগকে ব্যবহার করল। বিকাশের মনে হল যেন ওর আরেক উত্তরণ ঘটল।

২৯ তারিখ রাতে ফোন এল মুম্বাই থেকে। এইচ আর ডির হেড ডিস্যুজার ফোন। ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজারের পোস্টের জন্যে প্রস্পেক্টিভ ডিস্কাশন আছে। তাজ বেঙ্গলে। আজকাল আর ইন্টারভিউ বলেনা - বলে প্রস্পেক্টিভ ডিস্কাশন।

সময় সকাল দশটা, ৩০শে জানুয়ারি ১৯৯২।

ডিরেক্টর, সাউথ এশিয়া মিষ্টার ওয়াটসন নিজে আসছেন সঙ্গে প্রেসিডেন্ট - ডমেস্টিক মার্কেটিং, মিষ্টার জে কুমার। তিরিশ তারিখ সকাল থেকেই যাবে কি যাবে না ঠিক করে উঠতে পারছিল না বিকাশ। কিন্তু সকালে বাথরুমে দীপার কথা গুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠল আবার মনের মধ্যে - "তুমি কেমন স্থানু হয়ে গেছ। তোমাকে নিয়ে আমার কোনও অহঙ্কার নেই। তুমি কেমন যেন অল্পেতে সন্তুষ্ট টাইপ - তুমি না গড়েছ নিজের ক্যারিয়ার না আমাকে গড়তে দিয়েছ আমার ক্যারিয়ার - - - তুমি পারবেনা। তুমি হারছ, হেরে চলেছ বিকাশ আর আমাকেও তোমার পরাজয়ের সাথী করে নিয়েছ"। বিকাশ বিড় বিড় করে বলল - দীপা আর নয় অনেক হয়েছে তোমার গেম অব হুইমস!

এই ক'দিন দীপার সাথে দু এক বার কথা বলতে চেয়েছে বিকাশ। না ফেরানোর জন্যে নয়, ওদের সম্পর্কের অস্বচ্ছ ছবিটা পরিষ্কার করার জন্যে। বিকাশ কনফিউশন নিয়ে চলতে পারেনা। কথা বলতে গিয়ে দেখেছে দীপা কেমন যেন একগুঁয়ে হয়ে যাচ্ছে। দীপা কিন্তু খুব নিশ্চিত নয় কেন এই আচমকা সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। কখনও মায়ের কথা বলে বা কখনও খড়দহের গগনদার কথা বলে আবার কখনও নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে। তবে সম্পূর্ণ মায়ের ইন্ধনে ও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাও দীপা মেনে নিতে চায়না। এদিকে নিজেকে পরাজিত বলে মেনে নিতে পারছেনা বিকাশ। দীপা এরকম কেন করছে! ওর অনুযোগের শুরু ও শেষ খুঁজতে গিয়ে বিকাশের মাথাটা তালগোল পাকিয়ে যায়। কিন্তু বিকাশ স্থির করেছে যে ওর ভালবাসাকে ও দীপার খামখেয়ালীপনার খেলনা হতে দেবেনা। স্নান করে বেরোবার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিল যে ও যাবে তাজ বেঙ্গলে। দেখা যাক এর পরের কুমীরের পিঠটা কতটা কাঁটাময়।

বিকেলে বাড়ি ফিরল। বিকাশ আবার প্রোমোটেড। মনের ভেতরে জেতার আনন্দ আর ঘরের মধ্যে অনিশ্চিত নিস্তব্ধতার মধ্যে বিকাশ স্যুটকেস গোছাতে লাগল। দীপা অফিস থেকে ফিরে দেখল যে বিকাশ প্যাকিং করছে – কিছু বললনা। দীপা সফটওয়ার য়্যানালিস্ট। সলটলেকের উইপ্রোতে আছে আজ চার বছর হল। দীপার উদাসীন আচরণ দেখে বিকাশের মনে হলো বিকাশ যে অবশেষে বাড়ী ছাড়ছে এটা দীপার কাছে যেন এক স্বস্তি। কারণ দীপা বিকাশের যুক্তির সামনে অসহজ পড়ছে এটা দীপা জানে। বিকাশ তবুও ভেবেছিল যে দীপা একবার এসে জানতে চাইবে সে কোথায় যাচ্ছে? দীপা চুপ। বেশ। বিকাশ ও চুপ। এর মাঝে পড়ে গিয়েছে ওদের একমাত্র সন্তান তাতুন। সে রাত্রে বিকাশ ছেলেকে নিয়ে অন্য ঘরে শুয়ে শুয়ে বোঝাল যে ওকে কাজের জন্যে মুম্বাই চলে যেতে হচ্ছে। ও রোজ ফোন করবে। ছেলে তাতুন যেন বুঝল। কিন্তু বিকাশ জানে যে তাতুন কি রকম কষ্ট পাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। পরের দিন সকালে ফ্লাইটে বিকাশ মুম্বাই চলে গেল। ভোর বেলা যাবার সময় ছেলেকে বলে গেল।

মুম্বাইতে এসে বিকাশ জেদের বশে এক ধূমকেতুর মত কাজ করে যাচ্ছে ! ভালই করছে। লোক্যাল বা গ্লোব্যল বসেরা সবাই খুশি। তাতুনের সাথে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। ফোনটা রাখার পরেই শুরু হয় একটা যন্ত্রণা। ছেলের কাছে নিজেকে দোষী বলে মনে হয়। ছেলের সাথে খেলত ও রোজ বিকেলে। এখন ওর চার বছরের ছেলেটা বাবাকে খুব মিস করে। বলে - বাবা তুমি আমার সাথে খেলতে আসবেনা - তুমি তো আগে রোজ আমার সাথে খেলতে! ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। দীপা সব জানে। কিন্তু কোনও উল্লেখ মাত্র নেই। নয় মাসের মধ্যে বিকাশের ভাল কাজের আরেক পুরস্কার মিলল। সে মিষ্টার কুমারের জায়গায় প্রমোশান পেল। মার্কেটিং ডিরেক্টর। কুমারকে কমার্শিয়ালের হেড করে দেওয়া হয়েছে। এর পর বিকাশ আর পেছনে তাকায়নি। এর মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার প্রধান হয়ে ব্রাজিলে থেকে কাজ করে এসেছে প্রায় চার বছর। একা। তার পর রাশিয়া ও সি আই এস কাণ্ট্রীগুলোর হেড হয়ে দু'বছর মস্কোতে। দীপার একটা সাদা কালো ছবি পুরোন পার্সের মধ্যে আজও আছে। কিন্তু একবারের জন্যেও দীপার ছবিটা কে খুলে দেখেনি বিকাশ।

দীপা ফিরে এসেছিল বিকাশের কাছে ও ব্রাজিল থেকে ফিরে আসার পরেই। দীপা কেন ফিরে এসেছিল? ছেলের জন্যে না বিকাশের উন্নতি দেখে না বিকাশ যে হেরে যায়নি এটা দেখে? দীপা ভুল করেছিল এটা সে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি একটুও। পুনর্মিলনের প্রথম রাতটা ওরা দুজনে ওদের ওরলি সি ফেসের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে কথা বলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত। দীপা স্বীকার করেছিল, বিকাশ যখন ট্যুরে যেত তখন ও মায়ের কাছে এসে থাকত আর মায়ের কথার প্রভাব ওকে ওই রকম খামখেয়ালী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। দীপা কি অনাঘ্রাতা কিশোরী! দীপা কথা বলতে বলতে আছড়ে ভেঙ্গে পরেছিল বিকাশের শালপ্রাংশু বুকের ওপর। বিকাশ মেনে নিয়েছিল সব কারণ দীপা আর যাই হোক ওর ভেতরে

কোনও পাঁক নেই। এটা বিকাশ বিশ্বাস করে আজও। বিকাশ দীপাকে বলেছিল এরকম আর কোরোনা দীপা। আমিও মানুষ। এস আমরা আবার শুরু করি। বিকাশ ওর মনের দরজা জানালা খুলে রেখেছিল। বিকাশ দীপা কে হারাতে চায়নি। দীপাও একাই কাটিয়েছে ছেলে আর বাবা মা'কে নিয়ে এই ক'টা বছর। তাই যখন দীপা ফিরে এসে বিকাশের কাছে আর ওর ভুল স্বীকার করল তখন কিন্তু এক মুহূর্তও লাগেনি বিকাশের দীপাকে কাছে টেনে নিতে। ফিরে আসাটাও অদ্ভুত। হঠাৎ রাত সাড়ে নটার সময় ডোর বেল বাজল। বিকাশ দরজা খুলে দেখে সপুত্র দীপা দাঁড়িয়ে হাসছে মুখ টিপে, হাতে একটা ওভারনাঈটার স্যুটকেস। ট্যাক্সিতে সোজা এয়ারপোর্ট থেকে। দুজনে নীরবে দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকেই কাটিয়ে দিল। তাতুন সেই নীরবতা ভাঙ্গাল। মা ভেতরে এস! বাবা খুব ক্ষিদে পেয়েছে। ভেতরে আসার পর দীপা সোজা চলে গেল ব্যালকনিতে। তাতুন খুব ক্লান্ত ছিল। খেয়েদেয়ে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। সব কিছু এখন বেশ শান্তিপূর্ণ। তবু একটা কথা আজও খোঁচায় বিকাশকে। দীপা কি ওর সাফল্যকে ভালবাসে? নাকি ওকে? দীপা তো জেনেশুনেই এই বেচু কে বন্ধু ও স্বামী হিসেবে গ্রহন করেছিল। তাহলে? বিকাশের পদন্নোতি ওর কঠিন পরিশ্রম ও বুদ্ধিদীপ্ত কাজের ফল। আজ কি দীপা ওকে নিয়ে সুখী? তবে বিকাশ জানে এসব ভেবে কোনও লাভ নেই। ছেলে এখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। দীপা এখন আরও সুন্দর হয়েছে। বয়সের সাথে সাথে ও যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

ব্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস ট্রেনটা বেশ জোরে ছুটে চলেছে। সকাল থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলাবার সময় পায়নি। ওয়াটসন গ্লোবাল সিইও হয়ে চলে যাচ্ছেন আমেরিকায় আর সাউথ এশিয়ার দায়িত্ব বিকাশকে দিয়ে যাচ্ছেন। বিকাশ চেন্নাইতে আছে শুনে সোজা এসে নেমেছেন আজ সকালে। কাগজ পড়ার ফাঁকে ছেলেকে একটা এস এম এস করল - হাই! ওই টুকুই কিন্তু বাবা ছেলেতে একট বন্ধুত্ব আছে। সারা দিন ফেলিসিটেশন, য়্যাওয়ার্ড সেরিমনি, মিটিং, ক্লোজ ডোর স্টর্মিং, মিডিয়া ব্রিফিং সব সেরে বিকাশ ট্রেন ধরেছে কারণ ওর ব্যঙ্গালোরের ফ্লাইটের সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। আজ অনেকদিন পরে বিকাশ ট্রেনে চড়েছে। সখ করে নয়। ট্রেনে চড়ে লম্বা জার্নি করে কোথাও কাজে গেলে ওর মনে হয় ওকে আলসেমি চেপে ধরছে। কাজে কোনও গতি নেই। জীবনে প্রথম ফ্লাইট মিস করল বিকাশ! একটু অস্বস্তি হচ্ছিল বিকাশের কারণ নিজের ওয়ার্ক ডিসিপ্লিন নিয়ে ও খুব পিটপিটে চিরকাল। ভাগ্যিস চেন্নাই লোক্যাল অফিস এই ষ্ট্যান্ড বাই টিকিটটা কেটে রেখেছিল। কাল সকালের প্রেস ব্রিফিংটা য়্যাটেন্ড করতে পারবে ব্যঙ্গালোরে। তার পর সন্ধ্যেবেলায় দিল্লি। ধূমকেতুর মত গতি ও অবস্থিতি বিকাশের। পরের দিন সকালে আবার কলকাতায়।

ট্রেন ছুটছে। সঙ্গত করা দুলকি চালে হেলানো শরীরটাকে তুলে কাগজটা পাশে রেখে চশমাটা চোখ থেকে নামাল বিকাশ। বেশ জোরে একটা হাই তুলতেই বিকাশের হা আটকে গেল সামনের লোয়ার বার্থে এক অনাবিল সুন্দরী মহিলাকে দেখে। বেশ হৃদয়ে তুফান তোলা চেহারা। বেশ শৈল্পিক মাপে ভগবান তৈরী করেছেন। সর্বত্র সব উপাদান যথাযথ। আবৃত ও অনাবৃত সর্বত্রই উনি বেশ আকর্ষিকা ও মোহিনী। চোখ ফেরাতে বেশ একটু সময় লাগল বিকাশের। কিন্তু বিকাশের তাতে কি আসে যায়! রাতটুকু কাটলেই ভোর পাঁচটায় ব্যঙ্গালোর। এখন প্রায় রাত এগারোটা। ওপরের বার্থে দু'জন শুয়ে আছেন যাদের মুখ বিকাশ ভাল করে দেখেওনি, দুজনেই নাক ডাকার প্রতিযোগীতায় নেমেছেন। তারই মাঝে এক অস্বচ্ছ নীরবতা। সেই ঘোলাটে নীরবতা প্রথম ভাঙ্গালেন সুন্দরী মহিলাই। কথপোকথন ইংরেজীতেই। বেশ রোমান্টিক হাস্কি গলায় - মাফ করবেন আপনি কিন্তু খুব শান্ত। বিকাশ কি করবে আর না করবে তা না বুঝেই জিজ্ঞাসা করল আমাকে বলছেন? মহিলা খুব রসিক, বললেন না আমি এই ছড়ানো খবরের কাগজটাকে বলছি, বলেই খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন আমি উমা মহাদেবন।

আপনি? বিকাশ তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক করে নেয় নিজেকে - হেসে বলল - বিকাশ গুপ্ত। আমি বাঙ্গালী। কথাটা বলতেই বিকাশের চোখে মুখে এক দীপ্তভাব দেখতে পেল উমা। উমা আবার হেসে উঠে বলল - ইউ আর আ স্মার্ট গাই এন্ড আ প্রাউড বং। বিকাশ ভাবছে মহিলা খুব স্মার্ট।

উমা ঠিক কোন প্রদেশের সেটা না বলে দিলে বোঝা যায়না। পুরোপুরি কস্মোপলিটান সেলিব্রিটি লুক। তার সাথে এক দুর্বার ও দুর্বিনীত যৌন আবেদনের সৌদামিনি প্রকাশ। উমাকে মনে হলো কিউপিডের অর্ধাঙ্গিনী সাইকের মত। আমাকে উপেক্ষা করে দেখতো পার কিনা - এই রকম একটা নীরব আবেদন। বিকাশ নির্বিকার। ট্রেন ছুটে চলেছে। থামছে আবার চলছে।

কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে বুঝল আজ রাতে ঘুম হবার নয়। নাক ডাকার সিম্ফনি উদারা, মুদারা ছাড়িয়ে তারায় পৌঁছে আবার গভীর উদারায়। এরা দুজনে যেন সরগম পাঠ করে চলেছে।

চরম প্রতিযোগীতা চলছে দুজনের মধ্যে। বিকাশ তবুও শোওয়ার জন্যে বেড শিটটা টেনে পাতল। বালিশটা গুছিয়ে মাথার দিকে রাখতে যাবে, তক্ষুনি ট্রেনটা এক লহমায় হঠাৎ একদম নিশ্চল -থেমে গেল। আর উমা তার নরম শরীরটাকে আয়ত্তে রাখতে না পেরে বিকাশের গায়ে এসে লেপ্টে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের অসাড়তা। বিকাশ বাকরুদ্ধ। উমা নিজেকে সংযত করে নিতে নিতে সরি বলে বসে পড়ল। বিকাশের পক্ষে এ'এক নতুন অভিজ্ঞতা। উমার কাছে কিনা তা বিকাশ জানেনা।

স্বাভাবিক হোতে আরও কিছু সময় গেল। চেন পুল করেছিল কেউ। কি কারণে? সেটা জানার কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। বিকাশ টি টি ই কে জিজ্ঞাসা করেছিল। উমা খুব আদুরে গলায় বলল - মিষ্টার গুপ্তা, জাস্ট লিভ ইট। ইট ডাজন'ট ওয়ার্থ ইওর এফর্ট। বিকাশ নিমরাজী হয়ে বসে পড়ল। টি টি ই যেন শুনতে পায়নি এমন ভাবে চলে গেল।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। দুজনে সব রকম বিষয় নিয়ে কথা বলছে। উমা কখনও সখনও ড্রিঙ্ক করে কিন্তু স্মোকার্সদের পছন্দ করেনা। উমা মাঝে মাঝেই বিকাশকে কম্পলিমেন্ট দিচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার দখল দেখে আর বিকাশ প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ দিচ্ছে আর খুঁজে খুঁজে উমার প্রতিভার প্রশংসা করে চলেছে সীমার মধ্যে থেকেই। উমার বয়স বোঝা মুস্কিল। বত্রিশ বা তেত্রিশ হবে। কিন্তু ওর ছেলে সুইৎজারল্যান্ডে হায়ার এডুকেশন নিচ্ছে। উমা নিজেই বলেছে। ওর প্রথম স্বামীকে ও ত্যাগ করেছিল কারণ সে খুব সাদামাটা ছিল। উমা চায় শালপ্রাংশু পুরুষ তার গণগনে শরীরের আঁচে পুড়ুক এক সীমাহীন ঝলসানো সুখে। উমা নিজে এক আগুনের লেলিহান শিখা। এটা উমা বেশ ভাল করেই জানে এবং বুঝিয়েও দেয়। অবশ্য ওর হবু স্বামী যে কিনা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একজন ডিরেক্টর তার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। সে কথাও উমা গোপন করেনি। আর মাত্র এগার দিন পরে ওদের বিয়ে। উমার জীবনের ট্রেন কোন ধাতুর পাতের ওপর চলে! বিকাশ ভাবছিল। কিন্তু এই দুলকি চালের চলাটা বিকাশের ভালই লাগছে। চলা বিকাশের প্রিয়। থেমে থাকা ওর কাছে মৃত্যুর সমান। রবিবারে বাড়িতে বিকাশ হয় কার ওয়াশ করে, নয়তো রান্না করে নয়তো ড্রাইভে যায়।

বিকাশের ভদ্রতা এতক্ষণ ওকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। উমা বার বার বলা সত্যেও বিকাশ উলটো দিকের বার্থে বসেই কথা বলছিল। কিন্তু উমার বড় স্যুটকেসটা সিটের নিচ থেকে টানার জন্য উমা বিকাশকে অনুরোধ করল। বিকাশ উঠে এসে ওকে সাহায্য করল। আর উমা তখনই ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল তার পাশে, খুব কাছে, একেবারে ওর গা ঘেঁষে - নীরবে দু চোখের স্রোতস্বীনি চাহুনি দিয়ে বলল - এসো এসো এসো আমার কাছে এসো - আমি তোমায় খেয়ে ফেললেও তোমার ভালই লাগবে। উমার টসটসে ঠোঁটদুটো কথা বলে! বিকাশ ভাবলেশহীন। উমা ওর নরম হাতের তালুতে বিকাশের হাতটা নিয়ে জানতে চাইল, ও পামিস্ট্রিতে বিশ্বাস করে কিনা! উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে উমা বিকাশের ডান হাতটা ওর নরম হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। বিকাশ তার সম্পর্কে উমার ভবিষ্যত বাণী শুনছিল কিন্তু ওর ছোঁয়া বিকাশকে বলে দিচ্ছিল যে উমা বিকাশকে ওর শরীরটাকে মস্টাতে বলছে। একসময় খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উমা বিকাশের বাহুতে ওর উদ্ভিগ্ন, উদ্ধত যৌবনের প্রমান চেপে ধরল। উমার উষ্ণ স্তনবৃন্তের স্বেচ্ছা চাপে বিকাশ ক্রমশঃ শীতল হয়ে যাচ্ছে আর উমার ঘনিষ্ঠ হবার প্রবল চেষ্টা বেড়ে চলেছে। উমার শরীরি আবেদনের উত্তাপও ক্রমশঃ বাড়ছে। বিকাশের এই গায়ে পড়া সুন্দরীদের একদম ভাল লাগেনা। বিকাশ ওর হাতটা আলতো করে সরিয়ে নিল। বিকাশ উঠতে চেষ্টা করল। উমা ক্ষীন স্বরে বলল - প্লিজ বিকাশ!

উমা এডুকেশন ডট কম এর সিইও। বিরাট শিক্ষিতা মহিলা। কেম্বরিজের ট্রিনিটি কলেজের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। চেন্নাই ইউনিভার্সিটির পি এইচ ডি। ডক্টর উমা মহাদেবন। ইতিমধ্যে বিকাশ আরেকটু সহজ হয়েছে। উমা আরও সহজ। ওর ডিজাইনার সালোয়ার কামিজটা বেশ অগোছাল হয়েই আছে, তাতে যেন উমা আরও সহজ, দোপাট্টাটা পাশে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে নিচেও পরে যাচ্ছে আর উমা নিচু হয়ে কুড়িয়ে তোলার সময় বিকাশকে একবার বাঁকা চোখে দেখে নিচ্ছে।

বিকাশের চোখ এড়াচ্ছে না উমার উদ্ধত বুকের অহঙ্কারী প্রকাশ। যেন আরও বেশি করে দেখাতে চাইছে উমা তার লেলিহান ঔদ্ধত্য।

উমা বিকাশকে আরও সহজ বা বলা ভাল আরও তরল করার জন্য একস্ট্রা ম্যারাইটাল য়্যাফেয়ার্সের প্রসঙ্গটা নিজেই তুলে নিয়ে তার মতামত জানাল। জীবনটাকে উপোভোগ করার মধ্যে আরেক জীবন আছে। উমা বেশ জোরের সাথে ওর সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের তত্ব বোঝাল বিকাশকে। পার্টনার চেঞ্জ করার খেলাটা কি করে খেলতে হয় সে ব্যাপারেও উমার

সম্যক জ্ঞান ও বিকাশকে দিল উমা। এর পর বিকাশের মতামতের পালা। বিকাশ নিজেকে বেশ গুছিয়ে পেশ করল। বিকাশ উমার সঙ্গে একমত নয় এটা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে উমাকে বুঝিয়ে দিল। কিন্তু উমা যেন হেরে যাচ্ছে বিকাশের মানসিক স্থৈর্য্যের কাছে। উমার সাহস করে বলতে পারছেনা - আর ইউ ম্যান এনাফ? বিকাশ ততক্ষণে একটা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব হয়ে প্রকাশিত উমার সামনে। আর উমা চাইছে বিকাশ বুঝে নিক যে উমা ওকে চাইছে আজ এই রাতে, এই চলন্ত ট্রেনের বার্থের বিছানায়। উমার কাছে বিকাশ হল শ্রেষ্ঠ পুরুষ সঙ্গের হাতছানি আর বিকাশ কোনও উৎসাহই দেখাচ্ছেনা। উমা কথাটা ঘুরিয়ে বলল - আই আন্ডারষ্ট্যান্ড কোয়ালিটী বিকাশ। ইউ আর আ গ্রেট গাই।

বিকাশের অনাসক্তি উমাকে রাগিয়ে তুলছে আর বিকাশের বিরক্তি বাড়ছে। দীপার মুখটা মনে পড়ছে আর সেটা ওর মতামতের মধ্যে জানিয়েছেও উমাকে। কিন্তু উমা কাঁচ পোকার মত বিকাশের কাছে আসতে চাইছে। এবার বিকাশের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিল উমা। চকিতে হাতটা চেপে ধরল উমা ওর বুকের মাঝে আর বলল - আমি তোমাকে চাইতে শুরু করেছি বিকাশ। রাত তখন তিনটে। বিকাশ কুপে থেকে বেরিয়ে জানালার সামনে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ভাবল, এবার উমা নিজেকে গুটিয়ে নিক। ওর কাছে এই রাতের ট্রেন জার্নিটা এক বিভীষিকা। দীপাকে ফোন করতে গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সেলটা পকেটেই রেখে দিল। উমা কখন পেছন থেকে এসে দাঁড়িয়ে বিকাশের পিঠে হাত রেখেছে বিকাশ বোঝেনি। বুঝল যখন উমার ম্যানিকিওর করা নখের আঁচড় অনুভব করল, সেই সঙ্গে উমার উষ্ণ ঠোঁটের ছোঁওয়া ওর বাহুতে। বিকাশ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল - উমা আমি এই একরাতের শরীর চাইনা। দয়া করে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। উমা যেন পরাজিতা সিংহী! বলল, কেন? আমি কি এতই তুচ্ছ! বিকাশ বলল - না তা নয় আপনি ঠিক বুঝবেন না আমি কি বলতে চাইছি। তার পর ঝিঁ ঝিঁ ডাকা নিশ্চুপ এক ঘন্টা যেন শেষ হতে চায়না।

ট্রেন ব্যঙ্গালোর মেইন ষ্টেশনে ঢুকছে। বিকাশ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। পেছনে এসে উমা বলল আমি তাজ রেসিডেনসির স্যুটে থাকব। আজকের সব প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দেব যদি তুমি আস। বিকাশ আলতো করে উমার হাতটা সরিয়ে নিল ওর কোমরের ওপর থেকে আর বলল আমি বন্ধু হতে পারলাম না কিন্তু আমি আপনার শত্রু নই। তাই আমাকে মাফ করতে হবেনা,ভাল থাকবেন। দিল্লির ফ্লাইটটা রাইট টাইমেই আছে। বিকাশ ফোন করে জেনে নিয়েছে। লাঞ্চের সময় তাজ ওয়েস্ট এন্ডের রেস্তোঁরাতে দেখল উমা একটি দারুণ সুপুরুষ যুবকের কণ্ঠলগ্না হয়ে বিয়ার পান করছে। উমা উঠেছে তাজ রেসিডেনসিতে আর লাঞ্চ করছে এখানে! বিকাশ ওর কৌতুহলকে একেবারেই আমল দিলনা। শুধু উপলব্ধি করল। বিকাশের পদস্খলন হয়নি। বিকাশ নিজেকে আবার আবিষ্কার করল। আজ ওর সম্পৃক্তি - নিজের সাথে নিজের।

মুম্বাই
নভেম্বর ১৭, ২০০৬

সূচীপত্র

মিকুর উনিশে সেপ্টেম্বর

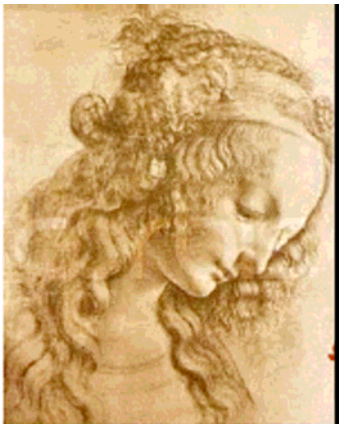

আজ উনিশে সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের বিয়ের ষোল বছর পূর্ণ হলো। ষোড়শী কিশোরী হলো এই বিয়ে! আমাদের বিছানার পাশের লম্বা আয়নাটাতে আমার দ্রুত পালটাতে থাকা অভিব্যক্তির frame by frame ছবি গুলো আমি দেখতে পেলাম। আমি শকুন্তলা। কাজলের প্রেম। কাজলের স্ত্রী। ওর ভাল নাম বসুমিত্র গুহ। আমি তুকুর মা। আমার শাশুড়ীর বৌমা। বিয়ের আগে বন্দোপাধ্যায় ছিলাম। আমার বাবা, জেঠু বা দাব্ভাই এমনিতে খুব উদার মানুষ। পদ্মপুকুরে আমাদের তিনতলা বাড়ীতে ষোলটা বিশাল বিশাল ঘর ছিল। বিকেল বেলায় ছাদে দাঁড়িয়ে শহর দেখা ছিল আমাদের স্বাধীনতার চুড়ান্ত প্রকাশ। বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের তিন বোনের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু বাইরে কত রকমের নিয়ম মেনে যে চলতে হত সে সব তুকু কে বললে ও হেসে উড়িয়ে দেয়। আমাদের তিন বোনকেই ছোটবেলায় শেখান হয়েছিল যে অব্রাহ্মণে গোত্রান্তরিতা হওয়ার চেয়ে চিরকুমারী থাকা অনেক বেশী সন্মানের। আমরা জানতাম, মেয়ে মানে মা দুর্গা, লক্ষীমন্ত, স্বরস্বতী। কন্যাসন্তান সংসারের বাঁধনি। আমাদের বাড়িতে দুর্গা পুজো আর কালী পুজো বেশ ঘটা করে হত। আমাদের পরিবারে গোঁড়ামী ছিলনা শুধু এই ব্রহ্মসন্তান হওয়ার অহঙ্কারের ঢক্কানিনাদ টুকু ছাড়া। কিন্তু এই সবই ঘরের ভেতরে।

আমি আমাদের বাড়ীতে কাউকে অন্যের জাত পাত নিয়ে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করতে শুনিনি। সবাইকে সন্মানের সাথে গ্রহণ করার শিক্ষা আমরা পেয়েছি ছোট বেলা থেকে। সাধু মামা তার জ্বলন্ত সাক্ষী। তবে বাঁড়ুজ্যে পরিবারের অন্তর্মহলে ভেতর অব্রাহ্মণের কোনও স্থান নেই। আমার বিয়ে কি করে হল তাহলে কায়স্থ পরিবারে? আমার বিয়েটা আমিই করেছিলাম। আমার জোর ছিল কাজল। কাজল আমাকে বিয়ের আগে সাত বছর ধরে আমাকে পুজো করেছে, ক্রমাগত বুঝিয়ে গেছে – ও আমাকে কত ভাল বাসে আর আমি রাণীর মত সেই সেই সুখ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছি। মাঝে সাঝে ও যখন ওর উষ্ণ হাতের তালু দিয়ে আমাকে ছুঁতো বা ওর পুরু গোলাপী ঠোঁট আমাকে পাগল করে দিত তখন মনে হোত যে আমার বোধন হচ্ছে। আমার পুজো করছে আমার সেবক। আমি সেই সুখ আজ ষোল বছর পরেও ভুলতে পারিনি। আমার দিদি সিতি আর ছোট বোন গিতির বিয়ে সৎ ব্রাহ্মণ পরিবারেই হয়েছে।

বাড়িতে জানাজানি হবার পরে যখন সময় এল বাবা জেঠাদের কঠোর বিধানের সামনে দাঁড়ানোর আমি তখন আমি বলতে পেরে ছিলাম আমার পুজ্যপুরুষ জেঠুকে - "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কাজলের, কাজল আমার আর আমি কাজলকেই বিয়ে করব।" তার পরিণতি? আমি সাধু মামার বাড়ি গিয়ে থাকলাম বিয়ের আগের তিন মাস। মা বাবা জেঠু বা দাব্ভাই কারোর সাথে যোগাযোগ নেই। কি অস্বস্তিকর সেই সব দিনগুলি! সাধু মামা ছিল কেবল এক সেতু, এক আশা। সাধু মামা মানে সাধন দাস কে আমাদের বাড়িতে সবাই ভাল বাসত। আমি সাধু মামার কোলে বর হয়েছি। আর কাজলের সাপোর্ট আমার ছায়া সঙ্গী ছিল।

কাজলের এক পিসির বাড়ী থেকে বিয়ে হলো আমার। আমার পৃথা মাসি আর সাধু মামা সব কিছু করেছিল আমার দিক থেকে। আমার বাবা অবশ্য শেষ মুহূর্তে ঠিক কন্যা দানের আগে এসে হাজির হয়ে ছিলেন। বাবা পারেননি থাকতে। মা পেরেছিল। বাবার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারায় আমি দেখেছিলাম যে মেয়ের জেদের কাছে তিনি হেরে গিয়েও খুশী। তবে বাবাকে এনে হাজির করানোর কাজটা সাধু মামাই করেছিল। সাধু মামা আমাকে ভীষণ ভালবাসত। আমার মা অনেক দিন পরে এসেছিলেন সম্পর্ক স্থিতু করতে। তখন আমার প্রেগন্যান্সির সাত মাস; তুকুর জন্মের ঠিক আগে। আমার পৃথা মাসি আর সাধু মামা আমাকে খুব মরাল সাপোর্ট দিয়ে ছিল। মজার কথা হলো যে এই পৃথা মাসি বা সাধু মামা কেউই আমার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় নয়। কিন্তু এরা তার থেকেও আপন। পৃথা মাসি চলে গেছেন আজ প্রায় সাত বছর। সাধু মামা এই তো সেদিন বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা বলতে বলতে গাড়ির মধ্যেই চোখ বুজলেন। সাধু মামা চলে গেল। কাজল ড্রাইভ করছিল। আমার সর্বত্র কাজল, কাজল আর কাজল। কাজলের ও সর্বত্র মিকু, মিকু আর মিকু। তাই কি? মাঝে মাঝে কাজল আমাকে

কুন্তি বলেও ডাকে তবে সেটা রাগের ডাক, মানে কিছু একটা অন্যায় হয়ত করে থাকব আমি, সেই সময়। তা আমি বেশ ভুল ভাল কাজ করে থাকি আর সেটার জন্যে দায়ী হল বসুমিত্র গুহর প্রশ্রয়। তাই তার শাসন, শিরোধার্য। কাজলের সব ভাল, সব, সব সব। শুধু ও যদি আমার কাছে থাকত। আর এই কাজটা না করত! ঈশ! কাজল কেন এটা করল?

গত মাসে কাজল যেদিন বাড়ি এল সেদিন দুপুরে আমরা একসাথে স্নান করলাম। আমার রোমান্টিক পাগলামীকে কাজল এত সুন্দর করে তোলে! উফফফ! সেদিন তুকু আমার মার কাছে গিয়েছিল আর আমার শাশুড়ীমা গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে তার ছোট বোনের বাড়ী। এই তো দিন পনের আগে হঠাৎ পুণেতে গিয়ে ছিলাম তুকুকে নিয়ে। কাজলই টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল। এ'বছর উনিশে সেপ্টেম্বর মানে আজ ও থাকবেনা আমার কাছে তাই আগাম সেলিব্রেশান। দুটো দিন খুব মজা করে কেটেছিল। আমি ওর নতুন হন্ডা সিভিক গাড়ীটা ড্রাইভ করলাম আর আমার পাশে বসে কাজল গুন গুন করে গান গাইছিল – 'কত দিন দেখিনি তোমায়' আর মাঝে মাঝে আমার গালে মুখ রাখছিল আর তুকু পেছনের সিটের নিচে মুখ লুকিয়ে বলছিল 'বাবি আমার চোখ ঢাকা -মেক ইট ফাস্ট'! চোদ্দ বছরের মেয়ে সব বোঝে। আমার মেয়ে তুকু ওরও খুব আদরের। তুকু চোদ্দতে পা দিল। বাপের খুব আহ্লাদী মেয়ে তুকু।

২০০১ এর জুনে আমরা যখন ইউরোপে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন কাজল আমায় বলল যে ও একটা দারুন কাজের অফার পেয়েছে Head of Operation হবার, আমি বলেছিলাম যে তুমি এই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নাও - তুমিই পারবে। তখন ও ছিল চেন্নাইয়ের একটা কোম্পানীতে। কিন্তু পোষ্টিং ছিল কলকাতায়। তার কিছু দিন পর, প্রমোশন পেয়ে চেন্নাই চলে যায় কাজল বছর চারেক আগে। তার পরেই সেই চাকরীটা ছাড়ে। গত তিন বছর হল ও পুণায় আছে। বিখ্যাত সেলফোন সার্ভিস প্রোভাইডার শেঙ্কেল এর CEO বসুমিত্র গুহ - আমার স্বামী। আজ চার বছরের ওপর কাজল বাইরে বাইরে কিন্তু প্রতিমাসে একবার ও বাড়ি আসবেই। দু'দিনের জন্যে হলেও বা আমাদের দেখা হবেই এই পৃথিবীর কোনও এক নিভৃত কোণে। আমাদের বিয়ে আজ ষোল বছরে পা দিল। কাজলের আজ বোর্ড মিটীং আছে সিঙ্গাপুরে। আজ উনিশে সেপ্টেম্বর। আমাদের বিয়ের তারিখ। কাজল কখনও ভোলেনা বিশেষ বিশেষ তারিখ গুলো। ওর সেলিব্রেশানের ষ্টাইলটাই আলাদা। আমি যদি রোমান্টিক বিন্দাস হই তবে বসুমিত্র গুহ হল 'the most efficient event manager'। আমি তালে গোলে হরিবোল - simply horrible। আমার মনে থাকেনা - তারিখ টারিখ। কাজলের থাকে। কাজলের কাছে আমি খুব প্রয়োজনীয় ও দামী হয়ে ওঠার চেষ্টা করিনি কখনও। কাজল আমাকে প্রায়ই বলত যে ও আমাকে কেন ভালবাসে। আমি যেন, শুনতে পেলাম কি পেলাম না এমন ভাব করতাম কিন্তু কান আমার খাড়া থাকত, একটা কথাও যেন বাদ না পড়ে। আর মন থাকত কাজলের কাছে বাঁধা। এই ষোলটা বছর যে শুধুই সুখের তা কিন্তু নয়। অনেক কষ্ট পেয়েছি আমরা একা একা এবং দুজনে একসাথে। আমার দঃুখের ভার লাঘব হয়ে গেছে আমার ভালবাসার বাঁধন আর তার প্রেমের পাখায়। আমরা দু'জন আলাদা জায়গায় কেন? কারণ কাজল চাকরী চেঞ্জ করে দু তিন বছর অন্তর অন্তর, তাই আমি আমাদের সম্পর্কের পাকা উইকেটটা কলকাতায় পেতে রেখেছি। তা'ছাড়া আমার কাজ সব কলকাতায়। আমার মা কে দেখার ব্যাপার ও আছে। দিদি পারেনা। সে নিজে একটা বড় জয়েন্ট ফ্যামিলির বড় বৌ, তিনটে বাচ্চা আরও কত সাংসারিক প্যাঁচ পয়জার! ছোট বোন তার সংসার আর দুটো বাচ্চা সামলাতেই হিমসিম।

আর মা বাবা আলাদা হবার পর থেকে আমি খুব ফিল করি দুজনের জন্যে। কাজলের সঙ্গ আমাকে মায়ের কষ্ট বুঝতে সাহায্য করে। আমি আজ ও বুঝিনি বাবা কেন ওই স্মল টাইম রেডিও সিঙ্গারের সাথে থাকেন। অনেক জ্বালা আছে আমার মনের মধ্যে মা বাবাকে নিয়ে। আমি জানি। আমি খুব সাধারন মেয়ে নই। পড়াশোনায় খুব ভাল ছিলাম। র‍্যাঙ্ক করতাম লরেটো হাউসে, প্রেসিডেনসি তে, এমনকি সি ইউ এর পল-সায়েন্স এর ফার্ষ্ট ক্লাস থার্ড আমি। আমাকে মডেলিং এর অফার দিয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম ফ্যাশন ফটোগ্রাফার, অনিল কে ডাট। দাব্ভাই থেকে বাবা সবাই দুর দুর করে না করে দিলেন। খেলাধুলা, গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় বা ডিবেট যাই করেছি সবই খুব মন দিয়ে করেছি। বাস্কেট বল আর টেবল টেনিস এর মধ্যমনি ছিলাম আমি স্কুলে। কাজলের আমাকে পছন্দ করা বা আমার প্রেমে পড়ার পেছনে এ'গুলো বেশ অনেকটা কাজ করেছে। কাজল আমার প্রেমে পরেছিল আমার নাচ দেখে আর প্রপোস করেছিল আমার গলায় "যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই, চঞ্চল আনমন, তবে ক্ষমা কোর হে, তবে ক্ষমা কোর হে, ক্ষমা কোর হে ঈশ্বর " গানটা খালি গলায় লুকিয়ে শুনে।

আজও আমি আমাদের দক্ষিণ কলকাতার এই ক্যাম্পাসে - গ্রীন ভ্যালী উৎসবে -প্রতিবছর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৃত্য নাট্য বা নাটক করাই। আবৃত্তি করলে নিজে বুঝতে পারি যে ভাল লাগছে। বয়স আমার মনের আগুনের কাছে নত হয়েই আছে আজ অনেক বছর ধরে। কাজল আমাকে আদর করার সময় বলে যে কি করে তুমি এখন এত আগুন ধরে রেখেছ মিকু! মিকু - এই নামে কেবল একজনই ডাকে আমাকে। আর কাজলের রোমান্টিক গ্রুভি আওয়াজে ওই আদরের ডাকটা শুনলে আমার শরীরে, মনে তোলপাড় হয়ে যায়। আজও। কাজল কেনা এটা করল? নিজে সক্রিয় ভাবে কাজ করি। আই আর ডি আই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এর ফ্যাকালটি মেম্বার আমি। ইনসিওরেনস ওয়ার্লডে আমাকে চেনে প্রায় সবাই। আমি একটা ক্যাটারিং ব্যোটীক চালাই। আমার ক্লায়েন্ট হল সব সেলিব্রেটি মহলের বাছা বাছা লোকজনেরা। আমি যদি একটা আইটেম রান্না করি তাহলে আমার কন্ট্রাক্টের বটম লাইন ফিফটি পারসেন্ট বেড়ে যায়। আমি টয়োটা প্র্যাডো ল্যান্ড ক্রুইজার চালাই। মারুতী বা ওই জাতীয় গাড়িগুলোকে আমার খেলনা মনে হয়। কাজল কিন্তু সেই তুলনায় খুবই সুবোধ ছেলে। নিজেকে কাজল একটু বেশীই ভালবাসে। আর আমি এটা চাই কারণ ও একা থাকে। নিজের যত্ন ও নিজে না নিলে কি করে চলবে! যাদবপুরের ইলেক্ট্রনিক্সের গ্র্যাজুয়েট। ব্যাস! কত করে বললাম এম বি এ টা করে নিতে, না ফিলিপস এর চাকরি হয়ে গেছে, ক্যাম্পাস থেকেই রিক্রুটমেন্ট কনফার্মড। তবে কাজলকে কিন্তু দেখতে খুব আকর্ষনীয়। টল, ফেয়ার,হ্যান্ডসাম। মেয়েরা ওর দিকে আড় চোখে তাকালে আমার নিজের বেশ গর্ব বোধ হয়। কারণ এই টল, ফেয়ার,হ্যান্ডসাম সুপুরুষের মালকিন এবং রাণী আমি। কাজল কোনও দিন আমার বিশ্বাসের অবমাননা করেনি। ও এই কাজ করতেই পারেনা। আমার কাজল আমার চোখের কাজল। আমার প্রাণের মানুষ কাজল। কাজল কি করে করল এর কাজ?

আমার বাবা খুব বড়লোক। কলকাতা শহরে বা প্রত্যন্ত প্রদেশে যারা পাকা বাড়িতে থাকেন তাদের উপায় নেই আমার বাবার কোম্পানীর নাম না জেনে। আগে মনোপলিই ছিল। এখন পাম্পসেটের বাজারে কিছু নতুন মুখ এসেছে। বাবা বেশ আছেন তার নতুন জীবন আর ব্যবসা নিয়ে। আমার মাও খুব গুণী মহিলা। চন্দনা ভট্টাচার্যকে চেনেনা কলকাতার শিক্ষামহলে এরকম খুব কম লোকই আছে। মা বরাবরই বিয়ের আগের পদবীটাই লেখেন। মা খুব ভাল গান গাইতেন। অসাধারণ আবৃত্তি করতেন। আর মায়ের পড়ানো? সেটা আমি, আমাদের কলেজের এক তরুণ লেকচারারের মুখে শুনেছিলাম, মায়ের পড়ানো নাকি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মত ছিল। তিনি মায়ের ছাত্র ছিলেন। মা আবার কট্টর রাজনীতিক। পলিটিক্যাল সাইনসের অধ্যাপিকা বলে শুধু নয়, মা'র কথা বার্তা খুব বিশ্লেষণাত্মক আর খুব যুক্তি বাদী মহিলা, মা আমার। আজ মাও একা। বাবা অনেক দিন আগে মাকে ছেড়ে এক সুতনুকার সঙ্গে থাকা শুরু করেন। বাবাকে আমি খুব ভালবাসতাম। এখন অবশ্য বাবার সাথে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। মার সাথে বাবার ছাড়াছাড়ি হওয়াটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। আমার মা এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে, এখনও পুরুষের কুপদৃষ্টি থেকে বাঁচেননা। বাবা যে কি করলেন না! আরে? এখন আমি মা বাবার কথা ভাবছি? এখন তো আমার ভাবা উচিত কাজলের কথা! নিজের কথা!

চিঠিটা কাজল রেজিস্টার্ড এ ডি করল কেন? ও কি ভেবেছিল আমি এই বিবাহ বার্ষিকীর অলঙ্কারকে অস্বীকার করব? আমার ষোড়শী কিশোরী বিয়ের পা টা পিছলে গেল, তাহলে? আমি ঠিক জানিনা কি করব এখন? তেইশ বছর ধরে তিল তিল করে আমি আমার ভালবাসাকে সাজিয়ে তুলেছি। কিন্তু কেন করল কাজল এই কাজ? আমি কি ওকে সবে দিইনি? আমার মন, আমার শরীর, আমার সোনা গয়না, এমন কি বাবার লুকিয়ে আমাকে দেওয়া, প্রায় এক কোটি টাকা। কাজল তো কখনও আমায় বলেনি বা বুঝতেও দেয়নি যে ওর মনে এতটুকু কষ্ট আছে! তবে এ' কেমন করে হল! এই তো দিন পনের আগেও আমাকে কত ভাল বাসল সারা রাত ধরে! আমি কেন একবারও বুঝতে পারলাম না যে কাজল আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে! আমার ম্যারেজ য়্যানিভার্সারী'র গিফট এসেছে। একটা এস এম এস - Isha is my lost love. I wanna settle with her. Please dont deny my last anniversary gift. Please sign on the papers. ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়েছে কাজল।

মুম্বাই
সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০৬

সূচীপত্র

রম্য রচনা

মাকড়সার জাল

মাকড়সার জাল। ব্যাপারটা খুব সাধারণ। খুব চোখে পড়ে, ঘরের আনাচে কানাচে, আসবাব পত্রের নীচে, খাঁজে, ফাঁকে-ফোকরে। ঝুল ঝারার আকসি দিয়ে ঘষে দিলেই হলো। এ আর এমন কি ব্যাপার। মাকড়সার জাল আবার www এর অর্থাৎ ওয়ার্লড ওয়াইড ওয়েব এর জন্ম সুত্রে প্রাজ্ঞ প্রপিতামহ। এই মাকড়সার জাল দেখেই নাকি সারা পৃথিবীকে এক সূত্রে ইন্টারনেটে গাঁথার কথা মাথায় এসেছিল ইন্টারনেট স্রষ্টাদের। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এদের বেশ সমীহ করে চলাই উচিত, মনুষ্যকুলের। অতি সম্প্রতি এই মাকড়সা কুল বেশ ভয়াবহ সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে মালয়েশীয়ার কুয়ালালামপুর শহরে। এই মাকড়সারা জ্ঞাতি গুষ্টি মিলিয়ে প্রায় সাত হাজারের ও বেশি ধরণের হয়ে থাকে। সে এক বিজ্ঞাপণ যাকে 'এন্টোমোলোজি' বলা হয়। সে কথা থাক।

অতি সম্প্রতি, মালয়েশীয়ার এক রেস্তরাঁর তিন মহিলা কর্মচারিণী মারা গেছেন যখন তাঁরা ছুটিতে ছিলেন। অনেক অনুসন্ধান করেও তাঁদের মৃত্যুর সঠিক কোন ও কারণ খুঁজে পাওয়া গেলনা। কেবল ফুড পয়জনিং কে সম্ভাব্য কারণ ধরে নিয়ে চুপ করে থাকা যায়না। কিন্তু তাই করতে হল। পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারীকেরা বেশ নাজেহাল। এর ঠিক কয়েক দিনের মধ্যে এক বয়স্ক ব্যক্তি সেই রেস্তঁরা সংলগ্ন এলাকাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরেন এবং প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তাকে সেই হাসপাতালের আইসিইউ তে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তারেরা প্রমাদ গোনেন কারণ ওই তিন মৃতা মহিলাও প্রায় একই রকম উপসর্গ নিয়েই অচৈতন্য অবস্থায় এসে ছিলেন এই হাসপাতালে। অনেক লড়াই চালিয়ে ডাক্তারেরা এই বৃদ্ধকে বাঁচাতে সক্ষম হন। এর পর শুরু আসল কাহিনীর।

ওই বৃদ্ধকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে তিনি খাবার কিনতে এসে ওই রেস্তরার ওয়াশরুমে গিয়ে কমোডের সীটে বসেছিলেন আর সেখান থেকে বেরোবার কিছুক্ষণ পরেই শুরু বিপত্তির। তিনি শুধু মনে করতে পারলেন যে কমডের সীট ছেড়ে ওঠার পর থেকেই তিনি তার গুহ্যদ্বারে ও তার আশে পাশে (anus and buttock) প্রচন্ড জ্বলন অনুভব করতে থাকেন যা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে; অবশেষে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এর পরের অধ্যায়ে আর ও খোলসা করে জানা গেল যে ওই তিন মহিলা ছুটিতে থাকলেও ঘটনার দিন খাবার কিনতে রেস্তরাঁয় এসেছিলেন এবং তিন জনেই ওয়াশরুমে গিয়েছিলেন। খাবার কিনে রাস্তায় বেরোতেই বিপত্তি। সাধারণ বুদ্ধি ফুড পয়জনিং কে কারণ হিসেবে ধরে নিল ওই তিন মহিলার মৃত্যুর পর। এর পর পুলিশ ও বিজ্ঞানীরা এলেন ওই রেস্তরাঁর ওয়াশরুমের সরেজমীন তদন্ত করতে আর পেলেন কমোডের সীটের নীচে ছোট্ট ছোট্ট অসংখ্য মাকড়সা যাদের কামড়ের পর বিষক্রিয়ায় মৃত্যুই হয়ে থাকে যদি না খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা করা যায়। খুবই ভাগ্যবান তিনি যিনি বেঁচে যান। এই মাকড়সার বিষ শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীকে বিষাক্ত করে তলে (effects of neurotoxins liberated from the saliva of the spider)। এই ব্যাপারে পড়াশোনা করতে হলে - Bites and Stings of medically important venomous arthropods Richard S. Vetter and P. Kirk Visscher,Department of Entomology, University of California, Riverside, CA 92521 USA এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মাকড়সা কে যতটা হেলায় আমরা দেখি ততটা সহজ প্রাণী নয় এরা। এর পর পাবলিক ওয়াশরুমের সীটে বসার আগে দেখে নিলে ভাল ওই ছোট্ট ছোট্ট মাকড়সাগুলো আছে কিনা। সাবধানের মার নেই।এ'ব্যাপারে আরও তথ্য পরে আলোচনা করা যাবে। তড়িঘড়ি এই সাবধান বার্তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলাম।

সূচীপত্র

কলকাতা
জুন, ৯, ২০০৬

সংরক্ষণ

সংরক্ষণের কথা বলতে গিয়ে অনেক কিছু মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। একটু অন্য রকমের কথা বলি।
চার রকমের দু পেয়ে জীব আছে যারা সবাই কোন না কোন ভাবে জীবন টাকে চালিয়ে নিয়ে যায় যত দূর পারে। এর মধ্যে আমি ও আছি। আমাদের সবাই এই চারের এক। এই চার কারা? এরা হলোঃ

- সব্জি বা ভেজিটেবল
- ধাতু বা মিনারেল
- জন্তু বা এনিম্যাল
- মানুষ বা হিউম্যান

ব্যাখ্যা দেবার আগে একটু বলি যে আমরা যারা সংরক্ষণ নিয়ে আজ দেশে কি চলছে তার একটু ও খবর রাখি তারা এই লেখনীর সত্বাধীকারির সংগে মীমাংসার মনভাব নিয়েই এই লেখা পড়বেন।
সব্জি বা ভেজিটেবল এর নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই। এদেরকে কেউ মাটি কেটে, বীজ পুঁতে, জল দিয়ে বড় করে তোলে। কেউ বেড়ে ওঠে আবার কেউ বা অকালেই শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। অন্যের সেবায় বেঁচে যারা বাজারে আসে তাদের রান্না করে খেয়ে শেষ করে দেয়া পর্যন্ত এদের কেউ টের ও পায়না যে এরা পৃথিবীতে কেন এসেছিল আর কেনই বা চলে গল বা কখন চলে গেল! কারণ এরা নিজে কিছু করেনা নিজের বেঁচে থাকার জন্য। কেবল দয়া ভরসা করে এরা বাঁচে আর বাঁচে ততো দিনই যত দিন না কেউ মারে বা যত দিন পর্যন্ত এরা শুকিয়ে না মরে যায়। এ রকম দু পেয়ে দের আমরা চিনি। আমাদের সমাজে এরা আছে। এরা যেখানে জন্মে ছিল সেখানেই মরে, একটু ও নড়া চড়া করে কিছু উৎপাদন করে নিজের বা পরিবারের বাঁচার ব্যবস্থা করা কে সমাজের অবিচার বলে মনে করে। **এদের চাই সংরক্ষণ।**

এবার আসা যাক ধাতু বা মিনারেল এর সংস্পর্শে। এরা প্রভূত শক্তিশালী পদার্থ। কিন্তু এরা পাহাড়, পর্বত বা শিলার গায়ে লেগে থেকেই এরা বেঁচে থাকে জড় পদার্থ হয়ে। কোন অন্য দু পেয়ে জীব এসে এদের কাজে লাগায়। ধরা যাক, ধাতু বাবুর কথা - তিনি আমাদের সমাজে কোন এক তলায় আছেন। তাঁর অনেক জ্ঞান আছে। তিনি মনে করেন যে সমাজ টা তাঁর উপযোগী হয়ে ওঠেনি এখন ও। তিনি নড়ে বসতে জানেন না। তাঁকে সব ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করতে হয়। তখন তাঁর অনেক জ্ঞানের কিছু প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। এই জাতীয় দু পেয়েরা সংখ্যায় কম নয়। **এদের চাই সংরক্ষণ।**

এবার যদি জন্তু বা এনিম্যাল দের কথা বলি তাহলে ব্যাপার টা আর ও একটু খোলসা হবে বলে মনে হয়। চতুস্পদ প্রাণীরা তাদের নিজেদের বাচ্চা কাচ্চা দের নিয়ে চলে। যেখানে যা ঘাস, গাছ গাছালি, বিচালি বা কোন প্রকার খাবার দাবার এরা ওই স্বল্প কয়েক জনের মধ্যেই ভাগ করে খায় আর বেঁচে থাকে এরা। কখন ও আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি ও করে থাকে এরা। এদের চোখ জোড়া মুখের দুপাশে থাকে বলে এরা সামনেটা ভাল করে দেখতে পায়না আর তাই ভবিষ্যৎ এর জন্যে কোন শিরঃপীড়া ও এদের নেই। এরা খুবই সংকীর্ণতার বশবর্তি আর তার জন্য চেতনার জ্বালা যন্ত্রণাও নেই এদের মধ্যে। কারণ অজ্ঞতা এদের ভুষণ। বহুতল অট্টালিকা গুলোতে এর ভাল উদাহরণ পাওয়া যাবে। পাশের ফ্ল্যাটে কে অসুস্থ বা কে একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তার খোঁজ রাখা আমাদের অনেকের অভ্যাসের মধ্যে নেই। কারণ মানসিকতা টা হলো - "হাম দো অর হামারে দো"। এই জাতীয় দু পেয়েদের কি আমরা দেখতে পাইনা? খুব পাই। বেশ সচরাচর ই দেখতে এদের। **এদের চাই সংরক্ষণ।**

চতুর্থ দু পেয়ে দের সম্পর্কে বলার আগে সংকর বা এ্যলয় নিয়ে একটু কথা বলা দরকার। এই তিন এর সংমিশেণে এক লোভী পেশাদার এর জন্ম হয়। রাজনীতিবিদ বলা হয় এদের। একটু নজর রাখুন। দেখবেন ইনসিকিউরিটি বা মানসিক অসুরক্ষা এদের মধ্যে বেশ বিদ্যমান কিন্তু এরা বুদ্ধিমান ও বটে। তাই এঁরা এই প্রথম তিন শ্রেণীকে চালনা করে থাকেন। নিজেদের ইনসিকিউরিটি বা মানসিক অসুরক্ষার ব্যাপারটা বেশ দক্ষতার সংগে এরা এই তিন শ্রেণীর মগজে ক্রমাগত

ঢোকাতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে আর সংগে থাকে তাদের পাইয়ে দেবার লিস্টি যেটা খুড়োর কল এর মত নাকের সামনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঝুলতেই থাকে। এদের চাই সংরক্ষণ বেশি করে। এদের বিষয় বোধ এর ক্ষুরধার বুদ্ধি সংরক্ষণের রক্ষা কবচ কে সুচতুর ভাবে ব্যবহার করে থাকে ভোট বাক্সের ওজন বারাবার জন্য। এখানে বলে রাখতে চাই যে সৎ এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদেরা আমাকে ভুল বুঝবেন না কারণ তাঁরা জানেন যে এই লেখনী কোন ব্যক্তিকে আক্রমন করার জন্য আদৌ উদ্দীপিত নয়।

চতুর্থ প্রকার দু'পেয়েদের নিয়ে আলোচনা সব চেয়ে জরুরী আজ। তাঁরা হলেন প্রনম্য মানুষ বা হিউম্যান। এঁরা শুধু নিজের টা বোঝেন না। পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ ও বিদেশ সব নিয়ে এরা চিন্তা করেন এবং বাঁচেন - বেশ ভাল ভাবেই বাঁচেন। এরা সমাজ কে এগিয়ে নিয়ে যান। এঁরা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু এঁরা কাজ করেন সবার জন্যে। মানুষের ভাল হোক এটাই এঁরা চান। আজ এদের খুব প্রয়োজন। আজ দেশ জুড়ে যে সংরক্ষণ বিরোধী ঝড় উঠেছে সে ঝড় যেন থামে তখনি যখন এই সংরক্ষণ এর রাজনীতি পুরোপুরি শেষ হবে। আমি এক জন সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রার্থনা করি সবার কাছে - আসুন এই সংরক্ষণের রাজনীতি কে শেষ করি। প্রতিভার কদর করি। আমরা ভারতীয়রা জানিনা যে আমাদের কি অসীম ক্ষমতা আছে এই ধরীত্রি কে রক্ষা করার। স্বামিজী বলেছিলেন, ভারতের বোধ শক্তি আর পশ্চিমের যন্ত্র কুশলতার মেল বন্ধন আরেকটা পৃথীবির জন্ম দিতে পারে।

ধন্যবাদ।

সূচীপত্র

১৭ই মে, ২০০৬
মুম্বাই

জীবনী

ভাল থাকুন হৃষিদা

হৃষিকেশ মুখার্জী। শো'ম্যান রাজ কাপুরের বাবুমশায় হৃষিকেশ চলে গেলেন। নিজের নামজ স্থানের গঙ্গায় বিলীন হয়ে তিনি রেখে গেলেন অনেক কর্ম, কীর্তি ও সৃষ্টি যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস লেখার কাজে উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

আমরা ক'জন জানি এ মানুষটিকে। ১৯৪০ এর কেমিস্ট্রির স্নাতক অঙ্ক ও বিজ্ঞান পড়াতেন, কলকাতায় বি এন সরকারের নিউ থিয়েটর ফিল্ম এডিটরের কাজ শুরু করার আগে। তারপর জুড়ে গেল কিংবদন্তী বিমল রায়ের সাথে। 'দো বিঘা জমীন' আর 'দেবদাস' সৃষ্টি করলেন বিমল রায়ের সহকারী পরিচালক হিসেবে। তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও তারপর ১৯৫০ এর প্রজাতন্ত্র স্থাপনাও দেখলেন। এই করতে করতে ১৯৫১ এসে গেল। চাপা বাঁম ঘেষা হলেও কখন ও বামত্বের গোঁড়ামি তাকে বা তার কাজকে ছুঁতে পারেনি।

এরপর তৈরী হলো 'মুসাফির'। মা লক্ষ্মী ফিরেও তাকালেন না। হতোদ্যম না হয়ে পরের ছবি 'আনাড়ী'র কাজে মন দিলেন। সেটা ১৯৫৯। এই আট বছরে তিনি অনেকটা স্থিতধী হয়েছেন। সেটা বোঝা গেল পাঁচ পাঁচটা 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার এই একটি ছবি থেকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছিলেন তাঁর গুরু ও শিক্ষক -বিমল রায়। শচিন কর্তার সাথে তাঁর ছিল আত্মিক যোগ। তাঁর অনেক ছবিতে শচীন দেব বর্মনের প্রাকৃতিক ভাবেই। মানুষকে প্রাণ খুলে হাসতে ও হাসাতে শিখিয়ে গেছেন তিনি তাঁর সব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কাঁদাতেও তিনি ছিলেন সমধিক পারঙ্গম।

দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারের সম্মান দেরীতে হলেও তাঁর সক্ষম জীবদ্দশাতেই এসেছিল এবং খুব ন্যায্যত তা হৃষিদাকে দিয়ে ভারত সরকার ধন্য হয়েছিলেন, তিনি নন। তিনি ইশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তাঁর সুকর্মের জন্য। এরপর পদ্মবিভূষণ পুরস্কার পাওয়া সেও যেন তাঁর প্রাপ্য বরমালা গলায় ঝুলিয়ে দিলেন স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে।হৃষিদা প্রায় সব তারকা অভিনেতা দের নিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ করেছেন নিজের জায়গা থেকে। ২০০৫ এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'হৃষিকেশ মুখার্জী রেট্রেস্পেক্টিভ' এর উপস্থাপনা বলে দেয় ভারতিয় চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর আবদানের কথা। আমি নিজে আবাক হয়েছিলাম তার 'সত্যকাম' দেখে। মাসল ম্যান ধর্মেন্দ্রকে দিয়ে তিনি কি কাজটাই না বের করে এনেছিলেন।

শুধু তাই বা কেন। সরল গল্প বলা এক ডিরেক্টর ছাড়া কতবড় সিনেম্যাটোগ্রাফার ছিলেন তা মুসাফিরের দিলীপ কুমার, আনাড়ির রাজকাপুর, নূতন, অনুরাধার বলরাজ সাহানি-লীলা নাইডু বা আনুপমার ধর্মেন্দ্র ও শর্মিলা অভিনয়ের কিছু মুহূর্তই মনে করিয়ে দেয়। আরও অনেক ছবির কথা মনে পড়ে। আনন্দ, নেমখারাম, মিলি, গুড্ডী, সাঁঝ অর সবেরা, আশীর্বাদ,বাওয়ার্চি, অভিমান, চুপকে চুপকে, গোলমাল,খুবসুরত কোন ছবিটা বাদ দেব! তালাশ, নামুমকিন, লাঠি, হাম হিন্দুস্থানী, আচ্ছা বুঢ়া, ঝুটি , সদমাজুর্মানা, নকরী, ঝুট বোলে কৌয়া কাটে, অর্জুন পন্ডিত বা আলাপ কোন ছবিটা হৃষিদা'র অসাধারণ নয়?

আজ উনি চলে গেছেন কিন্তু এত বড় একটা ভান্ডার রেখে গেছেন যার মূল্য অপরিমেয়।

তাই প্রার্থণা করি, হৃষিদা আপনি যেখানেই থাকুন আমাদের আশীর্বাদ করুন আমরা যেন হাসতে ভুলে না যাই।

মুম্বাই
আগাষ্ট ২৮, ২০০৬

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

আমি শিখেছি

আমি শিখেছি

অনেক অনেক দিন হলো। অনেক মাস ওর বছর গেল। শেষমেষ আমিও কিছু শিখে ফেললাম। তাই আর চুপ করে না থেকে আজ সেই কথা গুলো আমার প্রিয় পাঠকদের কাছে রাখছি। পড়ে যদি একমত হ'ন না হ'ন দয়া আরেকটু কিছু শেখার ব্যবস্থা করে দেবেন। সময় বড় কম। শেখার অনেক বাকী। তাই জোর কদমে পা চালিয়ে বলেই ফেলি।

আমি শিখেছি -

যে আমি কাউকে আমাকে ভালবাসতে বাধ্য করতে পারিনা। আমি ভাল বাসার পাত্র হয়ে উঠতে পারি। বাকিটা অন্যদের ওপর ছেড়ে রাখাই ভাল।

আমি শিখেছি -

কারও জন্য চিন্তা করা বা কারোর যত্ন করতে হলে আগে মনটাকে একমুখি করে তুলতে হবে। কারণ, ভালবাসা একমুখি।

আমি শিখেছি -

আমার সুনামের থেকে আমার চরিত্র অনেক বেশী দামী। চরিত্র হল আমি সৎ ভাবে জানি আমি কি, আর সুনাম হল অন্যরা কি ভাবে আমার সম্পর্কে। তিল তিল করে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠা এক লহমার ভুলে ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতে পারে।

আমি শিখেছি -

আমার কত জন বন্ধু আছে সেটা বড় কথা নয়। বিনা আমন্ত্রণে, আমার শ্মশানযাত্রায় কত লোক এসেছিল সেটা অনেক বড়।

আমি শিখেছি -

লোককে তাৎক্ষনিক ভাবে চমকে দেওয়া যায় একটা দুটো নতুন কিছু বলে বা করে কিন্তু একটা দীর্ঘস্থায়ী কথোপকথন চালাতে গেলে সমাজ ও মনস্তত্বের মধ্যে সাঁতার কাটা জানা চাই। এটা কোনও চমক নয়। এই অনুধাবন ব্যাপ্ত, গভীর ও নীরব।

আমি শিখেছি -

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে শ্রেষ্ঠের সাথে নিজের তুলনা না করে আরও ভাল কি করে করা যায় তার চেষ্টা করাই জীবনের পাথেয়।

আমি শিখেছি -

কি করে পড়ে গেলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে এই ভাবনাটা চেতনায় বিঁধিয়ে রাখা, আর কি করে উঠে দাঁড়াব সেটা নিয়ে কাজ করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমি শিখেছি -

তাৎক্ষণিক আনন্দ ভবিষ্যতের হৃদয় যন্ত্রণার কারণ।

আমি শিখেছি -

পাপ যতই লঘু হোক সমাজের চোখে সেটা পাপ আর তার সব সময় দুটো দিক আছে। এক দিকে অন্ধকার আরেক দিকে আলো। আলোটাকে খুঁজে পাওয়াই হলো পাপস্খালনের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

আমি শিখেছি -
যে আমার সারা জীবনটা চলে যাবে, আমি যে মানুষটি হোতে চাই তাই হোতে। এই বিনিয়োগ বুদ্ধিমানের কাজ। আমি তাই করার চেষ্টা করে চলেছি।

আমি শিখেছি -
প্রতিক্রিয়াশীল মন, সুচিন্তার প্রক্রিয়াকে ও মানুষের সুকুমার বোধকে বিনষ্ট করে দেয়।

আমি শিখেছি -
ভালবাসার মানুষগুলোকে আমোদ ও আহ্লাদের সাথে বিদায় জানাতে, কারণ কে জানে এই শেষ দেখা কিনা!

আমি শিখেছি -
চলা স্তব্ধ হয়ে যায় ঠিক তখনি যখন মন বলে 'আর পারছিনা'!

আমি শিখেছি -
আমার গতকালের কর্মের ফসল আমার আজ আর আমার আগামী কাল আমার আজকের!

আমি শিখেছি -
হয় আমি আমার আবেগ গুলোকে আয়ত্তে রাখব, নয় ওরা আমার জীবনটা চালাবে!

আমি শিখেছি -
সম্পর্কের শুরুর উত্তাপ সাময়িক। শীতলতার হাতে জীবনকে ছেড়ে দেবার আগে সম্পর্কের বাঁধুনি গুলোকে শক্ত করে নিতে হয়।

আমি শিখেছি -
বীরত্ব হলো পরিণতির কথা না ভেবে সমাজ এবং মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজটা আগে করে ফেলা। প্রকৃত বীর কখনও বিচারকের সবুজ ঝান্ডা কখন দুলবে সেই আশায় বসে থাকেনা।

আমি শিখেছি -
ক্ষমা করা সহজ নয়। ক্ষমা এক অভ্যাস।

আমি শিখেছি -
অর্থ হলো অনর্থের মূল। দিনগত পাপক্ষয়। তাই আমি টাকা গুনে নিইনা। ওতে হাত এবং মন দুইই নোংরা হয়।

আমি শিখেছি -
বন্ধুর সাথে সময় কাটানো অর্থনীতি বা হিসাব শাস্ত্রের জ্ঞান বহির্ভুত।

আমি শিখেছি -
আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো আমার স্ত্রী কারণ সে আমাকে আমার দুর্বলতা গুলোকে আগে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। তবে ব্যালানস্‌ের খেলাটা ও বোধহয় এই জীবনে ও আর শিখবেনা। ক্ষতি নেই, লাভ আমারই বেশী।

আমি শিখেছি -
রাগ হলো একটা আবেগ যাকে আমি ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তার দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারিনা। তা হলে, আমি নয়, হিংস্রতা আমার কর্মের মালিক হয়ে যাবে।

আমি শিখেছি -
বন্ধুত্বের কোনও ভৌগলিক সীমা নেই। ইন্টারনেট এখন সর্বত্র বিরাজমান। আমার বন্ধুত্বও।

আমি শিখেছি -
কে আমাকে কি ভাবে ভালবাসবে সেটা তার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বিচারকের ভূমিকা আমার জন্যে নয়।

আমি শিখেছি -
মোমবাতির সংখ্যা দিয়ে অভিজ্ঞতার মাপ করা যায়না। প্রতিটি জন্মদিন নতুন কি শিখিয়ে গেল সেটা অনেক বড় কথা।

আমি শিখেছি -
কোনও শিশুকে বলা উচিত নয় যে, সে তার সামাজিক অবস্থার জন্যে বিরাট কিছু হতে পারবেনা। শিশুরা স্বপ্ন দেখে। ওরা ঠিক পথ খুঁজে নেয়। একটি শিশুকে যদি এই বিশ্বাস দিতে পারি - তুমিই পারবে আর তার হাতটা ধরে একটু দিতে পারি তাহলে আমি মানুষ।

আমি শিখেছি -
আমার সাম্পর্কিক এবং রক্তসূত্রের সংসার আমার বহির্বিশ্বের সংসারের কাছে অতি ক্ষুদ্র। আমি এই দুই জগতের মহামিলনের চেষ্টায় আছি।

আমি শিখেছি -
আমার দুঃখ বা অর্জিত কষ্ট যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন আমার দুঃখে এই পৃথিবী থেমে যাবেনা!

আমি শিখেছি -
আমার পারিবারিক ইতিহাস বলে দেয় আমি কে কিন্তু আমি কি হব তা আমার ওপর নির্ভর করে।

আমি জানি -
আমার দুই বন্ধুর ঝগড়ার মধ্যে আমার কোনও পক্ষ নেওয়া উচিত নয় কিন্তু আমি এখনও দ্বন্দ্বে পড়ে যাই এই রকম পরিস্থিতিতে।

আমি শিখেছি -
যেখানে কোনও কলহ নেই সেখানে যে প্রেম আছে এটা ভেবে নেওয়া নির্বুদ্ধিতার সমার্থক। যে আমার সাথে সর্বদা তর্ক করে সে আমার বন্ধু ও হতে পারে।

আমি শিখেছি -
কখনও কখনও ব্যক্তিকে তার কাজের থেকে বেশী গুরুত্ব দিতে হয় কারণ ব্যক্তির একটা ইতিহাস আছে আর তার কাজটার কোনও ইতিহাস নাও থাকতে পারে।

আমি শিখেছি -
আমার বন্ধু বদলাবার দরকার নেই, কারণ বন্ধু বদলাতেই পারে কারণ সেও মানুষ।

আমি শিখেছি -
কৌতুহল দমনীয়। কারও গোপনীয়তার জমিতে পা না রাখলেও জীবন ঠিক চলবে। আর সেই জমিতে পা রাখার সাফল্য জীবনে অনেক অকাম্য পরিবর্তন এনে দিতে পারে।

আমি শিখেছি -
দুজন মানুষ একই শহরে থেকে সেই শহর সম্পর্কে সম্পুর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতে পারে। শহরটা কিন্তু একই থাকে, বিন্দু মাত্র বদলায় না।

আমি শিখেছি -

সন্তানকে যতই আগলে রাখার চেষ্টা কর না কেন, সে কিন্তু আদরের নামে অতি আরক্ষণ পছন্দ করেনা। ফলে সন্তানও কষ্ট পায় আর বাবা মা ও।

আমি শিখেছি -
প্রেমে পড়ার অনেক উপায় আছে আর সেই প্রেম টিকিয়ে রাখার আরও বেশী উপায় আছে। প্রেমে পড়া নয়, প্রেম কে বাঁচিয়ে রাখাটাই মুখ্য।

আমি শিখেছি -
পরিণতি কি হবে ভেবে লাভ নেই। সৎ ভাবে কিছু করলে সামনের বন্ধ রাস্তাও খুলে যাবে সেটা পাহাড়ও হতে পারে, যা সরে যাবে।

আমি শিখেছি -
নিজেকে বন্ধুত্বের প্রাসাদের স্তম্ভ মনে করলে একাই থাকতে হয়। তাই ইঁট, বালি বা সিমেন্ট হয়ে মিশে যাওয়াই ভাল। বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় তাতে।

আমি শিখেছি -
কোনও অপরিচিতও খুব ভাল বন্ধু হতে পারে। ক্ষণিকের পরিচয়ে জীবন পালটে যেতে পারে।

আমি শিখেছি -
যখন মনে হয় আর কিছু দেবার নেই ঠিক তখন এক বন্ধুর চোখের জল আমার দেবার শক্তি বাড়িয়ে তোলে।

আমি শিখেছি -
মনের কষ্ট ভাগ করে নিতে হয় - তা সে লিখেই প্রকাশ করি বা বলে।

আমি শিখেছি -
আমার চেতনার বাইরে অনেক সুকুমার বোধ আছে যা আমার জানা নেই।

আমি শিখেছি -
নামের পাশে অনেক ডিগ্রী থাকলেই মানুষ হওয়া যায়না। মনুষত্ব কোনও ছাপের দয়ায় তৈরী হয়না। তিনশ ষাট ডিগ্রী মান সম্পর্কে হুঁশ থাকা চাই।

আমি শিখেছি -
কাউকে বা কোনও সম্পর্ককে শক্ত আবেগের দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে সেই বাঁধন কেটে অসময়ে বা তাড়াতাড়ি চলে যায়। তাতে দুই কষ্ট। বাঁধার কষ্ট আর বাঁধন ছিঁড়ে যাবার কষ্ট।

আমি শিখেছি -
ভালবাসা কথাটার অনেক মানে আছে। কথাটা কে বলছে আর কাকে বলছে, সেটাই বড় কথা। কথাটা ব্যবহার করার আগে নিজের মনমন্দিরের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া বড় প্রয়োজন।

আমি শিখেছি -
ঠিক কোথায় সীমারেখা টানতে হয় এটা ঠিক করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ আমি কাউকে দুঃখ দিতে পারবনা আর নিজের মতামত জানাবার স্বাধীকারকেও অসম্মান করতে পারবনা।

আমি শিখেছি -
নিজেকে যদি অসম্মানিত মনে করি তবে আমি তাই হয়ে গেছি। যদি মনে করি আমার সাহস নেই তাহলে নেই। জেতার কথা ভাবার আগে যদি হারার কথা মনে আসে তবে আমি হেরে বসে আছি। সাফল্যআত্মবিশ্বাসের

সুসন্তান। আর সন্তান এক দায়িত্ব যার থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হওয়া যায়না।
সাফল্যও তাই। শুধু মনকে বোঝাতে হয় - আমিই পারব। আমিই করব।

এখন প্রশ্ন হল - এই আমি কে? আমি হলাম একজন মানুষ। আমি হলাম লক্ষ কোটি মানুষের সমাহার। আমি হলাম দেশ। আমার দেশ। তোমার দেশ। ভারতবর্ষ। আমি এই পৃথিবী। আমি সবার সাথে একটা সত্য ভাগ করে নিতে চাই। সেই সত্য হল এই কথা বলতে পারার ক্ষমতা যে - আমি শিখেছি। কিন্তু আমি শিখেছি– অসম্পুর্ণ আছে। অনেক পথ চলতে হবে। আসুন একসাথে কিছু করি।

মুম্বাই
সেপ্টেম্বর, ১৯, ২০০৬

সূচীপত্র

ব্রাত্য চিন্তায় যুক্তি বোধ

আচ্ছা, কেউ গত হলে আমরা কেন প্রার্থনা করি - "হে ঈশ্বর তাঁর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করুন'! May his soul rest in peace! আমার এই ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি আছে। কেন এবং কি ভাবে আমরা একজনের আত্মার বিশ্রাম চাই! আত্মা তো এনার্জি। শক্তি। তার কি বিশ্রাম হয়!

একটু ভেঙ্গে বলি?

এই মহাবিশ্বের তিনটে অংশ আছে বলে আমরা জানি। স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল।

আমার মনে হয়, মর্ত বা পৃথিবীটা কোথায় তাই নিয়ে কোনও বিবাদ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল - এই পৃথিবীটাই কি মর্তলোক? খুব গোলমেলে - তাই না? ধরে নেওয়া যাক এই পৃথিবীই মর্তলোক। পাতালের অস্তিত্ব নিয়েও বোধ হয় কোনও বিবাদ নেই। যা আমাদের নিচে, তাই পাতাল। কেউ যদি পাপকর্ম্ম করে বা খারাপ কাজ করে সে পাতালে যায় বা নরকে যায়। এই রকমই শুনে বা জেনে এসেছি ছোট বেলা থেকে। এখন প্রশ্ন হল - আমাদের নিচে কি আছে? মাটি, পাথর, জল, উর্জ্জা, আগুন এবং আর অনেক আকরিক খনিজ পদার্থ। তা'হলে দাঁড়াল, মাটির নিচে যত সব ভূমিজ ও খনিজ সমৃদ্ধি জমা আছে সেগুলো হল পাতালের আওতায় এবং নরকের অর্থনীতির স্তম্ভ। আর পাপ করলে বা খারাপ কাজ করলে সেই পাতাল সাম্রাজ্যের বাসিন্দা হতে হয়। এও মেনে নিলাম। কিন্তু পরিকল্পনা করে সজ্ঞানে পাপকর্ম করব সেই ক্ষমতা বা রুচিও নেই। তাহলে পাতালে যাওয়া হবেনা। অর্থাৎ ওই ধনীতম পাতালদেশের নরকপুরের বাসিন্দা হওয়া যাবেনা। কিন্তু আমাদের উপরে? আরও উপরে? সেখানে কি আছে? আমরা সবাই বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে আমাদের উপরে এক নির্মল স্থান আছে যার নাম স্বর্গ, যেখানে মৃত্যুর পরে সব ভাল মানুষেরা যায় আর রম্ভা, মেনকা বা উর্বশী দের নাচ উপোভোগ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করে যে আমাদের উপরে স্বর্গ নামক এক 'সুখধাম' আছে। কিন্তু যীশু যখন তাঁর কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তখন কি ছিল সেই দৃশ্য? তাকে কি রাঈগর মর্টিস বলা হবে? মরে শুখিয়ে কাঠ! বেশ কেমন যেন শুস্কং কাষ্ঠং লাগছে - না? আর বিড়ম্বনা না বাড়িয়ে এগোন যাক। কিন্তু এখন সমস্যা হল কতটা উপরে গেলে স্বর্গের দেখা পাওয়া যাবে? ওষুধ বেচার কাজে আকাশপথে ভ্রমণ করতেই হয়। আমি একটা হেলথকেয়ার কোম্পানীর সাথে যুক্ত আছি, উপদেষ্টা হয়ে। যতটুকু জানি যে গড়ে ৩০০০০ ফুট উঁচুতে ওড়ে ইন্ডিয়ান, ৩৫০০০ ফুটের মাথায় জেট, ৪০০০০ ফুটে এমিরেটস, ৪৫০০০ ফুটে নর্থওয়েষ্ট এয়ার লাইনসের বিমান গুলো। এদের পাইলটেরা কি কেউ স্বর্গের খোঁজ পেয়েছেন আজ পর্যন্ত? না। এরা কেউই স্বর্গের খোঁজ পাননি আজ পর্যন্ত।

আচ্ছা এবার পক্ষী জগতে প্রবেশ করা যাক। সবচেয়ে উঁচুতে ওড়ে বোধ হয় বাজ পাখী। না কি চিল? পক্ষিবিশারদেরা কি কোনও চিহ্ন বা সূত্র পেয়েছেন পাখীদের আচার আচরণে যে তারা স্বর্গের সন্ধান পেয়েছে? তাদের গবেষণার মধ্যে কি পাখীদের গায়ে স্বর্গের সুগন্ধ পাওয়া যায়? না। সেরকম কোনও কিছু ঘটলে টি ভি চ্যানেল গুলো ২৪/৭ প্রচার চালাত। ইন্টারনেট তো গবেষণার গ উচ্চারণের শুরুতেই প্রচার চালাত কে আগে এই খবর তাদের সাইটে প্রকাশ করেছে - এই বলে!

তাহলে প্রশ্ন হল স্বর্গ কোথায়? ৪৫,০০০ ফুটের ওপরে? কই কল্পনা চাওলা বা তাঁর পুর্বসূরী বা উত্তরসূরীরা কেউ তো বলেননি যে তাঁরা স্বর্গ দেখেছেন! না। হাসির কথা নয় - স্বর্গ কোথায়? জানতে হবে। সে কি অন্য কোনও সৌরমন্ডলে বিরাজ করে? আর তা যদি সত্যিই থেকে থাকে তাহলে কোনও বিজ্ঞানী এত দিনে নিশ্চিত তার খোঁজ পেতেন! এত দিনে স্বর্গে পৌঁছবার এলগোরিদম ইন্টারনেটে ৯৯ ডলার দিয়ে কেনা যেত।

আচ্ছা ব্যাপারটা কি এরকম যে সব ধ্বনাত্মক জ্ঞান সাহিত্যে বা ধর্ম গ্রন্থে বা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে সেগুলোকেই আমরা সর্বাত্মক জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলে ধরে নিই আর তাই স্বর্গ খুঁজতে গিয়ে যত বিপত্তি? কিন্তু আমি বিপত্তি থেকে মুক্তি চাই। তাই আমার মত করে চিন্তা করতে শুরু করেছি। এটাকে পাগলামী ভাবলেও আমি থামছিনা। আমার ধারণা স্বর্গ বা মর্ত বলে কিছু নেই। আমরা এ'ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করব।

"আসলে বস্তু, মন ও আত্মার মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। বোধের বিভিন্ন স্তরে এদের অর্থ পালটায় আর আমরা এদের আলাদা করে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকি। এই বিশ্বকে আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বুঝি বা বোঝার চেষ্টা করে

থাকি। সৎ দেখে স্বর্গ আর অসৎ দেখে নরক। কিন্তু কোন নরক? যাক সে কথা। ঈশ্বরীয় মন ইশ্বরকে দেখে। স্বর্গ বা মর্ত বলে কিছু আছে কি? আমাদের মানে পশু সাম্রাজ্যের শরীর মাংসলজস্থী জল ও আত্মার সম্মিলিত অস্তিত্ব। ৭০ শতাংশ জল, স্নেহ, মাংস, শর্করা ও আরও অনেক খনিজ পদার্থ। ৩০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ও বিদ্যুতীন সুইচ।

ধরে নেওয়া যাক এই রকম একটা ব্যাপার হলো আমাদের শরীর। এই দিয়ে আমাদের শরীর চলে। ঠিক যেমনটি একটি কারখানায় ঘটে। সেখানে উৎপাদন ঘটে যদি মেশিনের যন্ত্রাংশ সব ঠিক জায়গায় থাকে আর সুইচটা ঠিক মত অন করা যায়। এখন প্রশ্ন হল এই সুইচটা কি? সুইচটি হলো আত্মা। আত্মা হোল মহাবিশ্বের আলোক রশ্মীর দ্বারা আবিষ্ট ও তরঙ্গান্বিত, উর্জ্জাশক্তি। যে মুহূর্তে এই সমন্বিত শক্তি বস্তু শরীরকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের বস্তু-শরীর এই শক্তির দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। শরীর কাজ করে। এখান থেকে উঠে ওখানে যায়। শরীর উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে। আত্মার সৎ এবং অসৎ -দুই ভূমিকাই হোতে পারে।

সদাত্মা নামক সুইচ শরীরকে পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে। উৎপাদনশীল করে তোলে। একটা উদাহরণ দিই। কেউ ভাল গান গায় বা কেউ ভাল ছবি আঁকে বা কেউ খুব ভাল ক্রিকেট খেলে। এদের সবার সদাত্মা নামক সুইচ অন হয় আর তাই তারা ভাল ভাবে কাজটা করতে পারে। আবার কেউ পৃথিবী ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। বা মানুষ খুন করার সুপারিশ নেয় বা দেয়। কিম্বা কেউ মনে করে প্রতিবেশীর স্ত্রী বেশী পারদর্শিনী নারী। এদের অসদাত্মা নামক সুইচ অন হয়। এদের শরীর উৎপাতশীল হয়ে ওঠে - প্রথমত তার চারপাশের পৃথিবীর জন্যে আর পরে তার নিজের জন্যেও। আত্মা নামক সুইচের প্রয়োগ কে কি ভাবে করবে তা নির্ভর করে তার পারিবারিক, সামাজিক শিক্ষা এবং তাৎক্ষনিক অবস্থানের ওপর।

আমরা মানুষ। মানুষ ভালবাসার উৎপাদন। তাই বেশির ভাগ মানুষই সদাত্মা নামক সুইচের বা বিবেকানন্দাত্মক সুইচের দাস। আমরা এই সুইচের কর্মকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, অনুসরণ করে থাকি। ব্যতিক্রম হল লাদেনাত্মক আত্মা বা অসদাত্মা। এই সুইচের সম্পর্কে আমাদের মতামত নিয়ে এখানে আলোচনা করছিনা। সেটা ছেড়ে রাখলাম প্রত্যেকটি সদাত্মানামক সুইচের দায়িত্ব জ্ঞানের ওপর। একটা পাথরের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। এর কি কোনও প্রাণ আছে? অবশ্যই আছে। কিন্তু এর ব্যবহারিক জীবন এত ধীর গতিতে চলে যে তা আমাদের চর্ম চক্ষুর নজরে পড়েনা। কিন্তু একজন রোগীর নজরে পড়ে। কুল্লুর কাছে মনিকরন বলে একটা জায়গা আছে যেখানে বসে সন্ত গুরু নানক ধয়ান করেছিলেন। সেই স্থানের পাথর জীবিত। তার মধ্যেকার তরঙ্গ অনুভব করা যায়। মাপা যায়। কিম্বা বারানসীর সঙ্কটমোচন মন্দিরের পাথর যা রোজ এক শস্য দানার আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাপা যায়। বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত। তাহলে পাথর যদি বস্তু হয় তবে মানব শরীরের মাংসলজস্থী জল ও বস্তুর সমতুল্য। এই পাথরের মধ্যেও এক সুইচ আছে যা তাকে চালনা করে থাকে। অমরনাথের শীবলিঙ্গ কি করে শ্রাবনী পূর্ণিমায় আকার পরিবর্তন করে? বেপথু হয়েছিল মন। এই একটু বেরিয়ে এল মন।

এবার ফেরা যাক স্বর্গ ও মর্ত প্রসঙ্গে। স্বর্গ ও মর্ত একই জায়গার দুই নাম। আমার তাই মনে হয়। স্বর্গ বলে কোনও আলাদা জায়গা নেই। গীতায় কি স্বর্গ বলে কোনও স্থানের উল্লেখ আছে? হ্যাঁ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন - "হয়তো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং" মানে স্বর্গ আছে। কিন্তু স্বর্গ কোথায় সেটা কি তিনি বলেছেন? সব ধর্মেই বলা আছে যে একবার যখন আত্মা শরীর ছেড়ে যায় - মানে মৃত্যুর পর - তখন শরীরকে বিনষ্ট করে দিতে হয়। হিন্দুরা পুড়িয়ে ফেলে, মুসলমান বা খ্রীষ্টানেরা পুঁতে ফেলে বা জরোয়াস্ট্রীয়ানেরা টাওয়ারের ওপর রেখে আসে। উদ্দেশ্য একটাই - বিনষ্ট করে দেয়া। উল্লেখ করা যেতে পারে - প্রাচীন কালে কবর দেওয়া হোত চুণাপাথর দিয়ে তৈরী বাক্সের মধ্যে। কারণ তাতে ঠিক ৪২ দিনের মধ্যে শরীর বিনষ্ট হয়ে যেত। দেহ পুরোপুরি বিলীন হয়ে যেত। আমাদের পূর্বজরা অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। তাই না? কিন্তু তাতে কি আত্মার বিনষ্টিকরণ সম্ভব? না। আত্মাকে বিনষ্ট করা যায়না।

আমরা আত্মা নামক সুইচটিকে ভুলে মেরে দিয়েছি। আর শরীর নিয়ে খুব ভাবি আমরা। আমরা শরীর নিয়ে কাঁদি মৃত্যুর পর! কিন্তু ফল কি? নাজিম হিকমতের কবিতায় পড়ি - বিংশ শতাব্দীতে যে কোনও সোকের আয়ু মাত্র এক বছর। বিশ্বাস হলোনা? মৃত্যুর পর-

প্রথম বছর - মৃতের ছবি ড্রয়িং রুমের দেয়ালে জ্বলজ্বল করে,

দ্বিতীয় বছর - ঝাপসা ছবি শোবার ঘরে আর

তৃতীয় বছর - ভাঙ্গা ফ্রেম অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে।

এরকমটাই হয় নাকি? কি ভাবছেন, পাঠক? এ হলো পাগলামীর কথা। এ কিন্তু কথার পাগলামী নয়। এখনও অনেক জটিলতা মস্তিস্কে গজগজ করছে। এই আত্মা কে? কি হয় এর মৃত্যুর পর? সনাতন ধর্ম বা পরবর্তিতে আমরা যাকে হিন্দু ধর্ম বলি সেই ধর্ম এই ব্যাপারে কিছুটা এগিয়ে আছে। সনাতনী বিশ্বাস হলো আত্মা অবিনশ্বর। তাকে ধ্বংস করা যায়না। পুড়িয়ে দিয়েও না। (নৈনঁ ছিন্দন্তি, শস্ত্রাণি, নৈনঁ দহতি পাবকঃ)। আত্মাকে কাজ করে যেতে হয়। হবে। তাই মৃত্যুর পরেও আমরা একান্তে কথা বলি মৃতের সাথে। তার কাছ থেকে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করি। আমি তো আজও আমার মা বাবার সাথে কথা বলি। দুজনেই গত হয়েছেন এক দশকের ওপর। তাঁদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে থাকি। আধুনিক সায়কিয়াট্রি একে বলবে 'হ্যালুসিনাশান' কিন্তু ওই সায়কিয়াট্রিস্ট ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তিনি কি তাঁর মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয় বা অনাত্মীয়দের সাথে কখনও একান্তে কথা বলেননি বা বলেননা? তিনিই জানেন। আবার ওই সদাত্মা নামক সুইচের কথা এসে যায়।

আত্মা মহাজাগতিক শক্তির এক অংশ। আসলে প্রত্যেকটি আত্মাকে তার জন্যে নির্দিষ্ট কাজগুলি করে যেতে হয়। আর যেই আত্মা তার জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করে ফেলে তখনি মহাজাগতিক শক্তি বেরিয়ে আসে। আর এক অদৃশ্য এলকেমিস্ট' এর জাদু দন্ডের সাহায্যে সেই শক্তি আরেক মানব শরীরে প্রবেশ করে। এরকম হতেই থাকে বা চলতেই থাকে। অহরাত্র, চব্বিশ ঘন্টা আর তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। এটা ঠিক এক কনভেয়র বেলটের মত যা বহন করে চলেছে কোটি কোটি অনু যা নির্দিষ্ট হয়ে আছে প্রাণ পাবার জন্যে - হয়ত বা মানুষ হয়ে জন্ম হবার জন্য বা পশু বা শস্য বা কোনও কীট বা পতঙ্গ বা এক সুগন্ধী ফুল হবার জন্য বা পাথর। চলার পথে যেই মুহূর্তে সেই অনু আত্মার ছোঁয়া যে পায় সে প্রাণ পেয়ে জীবিত হয়ে ওঠে। আত্মার বিশ্রাম? এত কাঁঠালের আমসত্ব খোঁজার চেষ্টা করার সামিল। কি অবাক করা কান্ড কারখানা - না? এলকেমিষ্ট টি কে? জানিনা। তবে আছে একজন। ব্যাপারটা কি খুব জটিল? না মনের জানালা গুলোকে খুলে দিয়ে ভাবলে এই ব্যাপারটা খুব সোজা।

আসলে -

স্বর্গ আমার মায়ের দেয়া প্রাণ
স্বর্গ আমার আমন ধানের ঘ্রাণ
নরক আমার মনের মধ্যে পুষে রাখা মালিন্য
নরক আমার আতরগন্ধী লোক দেখানো কৌলিন্য
পাতাল আমার নীতিবোধের স্খলন
পাতাল আমার পশুত্ব শক্তির লালন
স্বর্গ হেথা স্বর্গ হোথা স্বর্গ ঘরে ঘরে
ভালবাস প্রাণশক্তিকে
-স্বর্গ স্বর্গ না করে।

পরিশেষে বলি। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। অন্তরে আমরা খাঁটি ও নিখাঁদ। আমাদের মধ্যে পবিত্র মাটি, বায়ু, জল, ধাতু ও আগুন আছে। এসো আমরা তার প্রকৃত সমাদর করি আর নিজেকে উজাড় করে দিই এই মানব জন্মেই। পরজন্ম কি জানিনা। তবে যদি আবার মানুষ হয়ে জন্মাতে পারি, নিজেকে পূণ্যবান মনে করব। তাই, কেউ শরীর ছেড়ে চলে গেলে প্রার্থনা করি - হে ঈশ্বর ওঁর আত্মা শান্তিতে থাকুন আর বাকী কাজটুকু করে যান - "হে ঈশ্বর তাঁর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করুন' নয়!

মুম্বাই
অক্টোবর ১৭, ২০০৬
গবেষণা - অরুন কুমার বিশ্বাস
হায়দ্রাবাদ

সূচীপত্র

স্বদেহ মনের ঘরে প্রেমের বাসা

এক গোলোক ধাঁধা। প্রেম দেহে না মনে? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই আলোচনা যেন শুধু এক সময়ের অপব্যয়। আবার এই ধন্ধে পড়েনি এমন নারী বা পুরুষ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অশরীরি আত্মার সাথে প্রেম করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন কেউ, এমনটা রোজ শোনা যায় না। ঘটলেও তা তাৎক্ষণিক সেটা এক গভীর অবসেষন। সে নিয়ে এই আলোচনা নয়। ইংরেজী Lust কথাটার মানে কি? লাস্যকাম। লাস্যকাম কথাটা লিঙ্গ বিহীন। মানে কোনও নারীশরীর কল্পনা করে বা তাকে দেখে পুরুষের বা বিপরীতে কোনও পুরুষ শরীর কল্পনা করে বা দেখে এক নারীর যে জৈবিক ক্ষুধা জাগে তা কে কি লাস্যকাম বলা যায়? হ্যাঁ। ঠিক তাই। আসলে অবলোকন কাম লাস্যকামের জন্ম দেয় আর লাস্যকাম যখন জৈবিক রতি ক্রিয়ায় পরিণত হয় বা দুটি শরীর যখন আষ্টে পৃষ্ঠে দুজনে দুজনার শরীরের স্বাদ নিতে লিপ্ত তখন কি ঠিক প্রেম কথাটার কোনও জায়গা থাকে? শুরুতে থাকেনা। ধীরে ধীরে তৈরী হয় যদি না নারী বা পুরুষ সঙ্গী বদল করার অভ্যাস করে থাকেন। ধীরে ধীরে একটা জায়গা তৈরী হতে থাকে এক বীজের আকারে। লাস্যকাম হল প্রেমের বীজ। প্রেমের জন্ম হয় জৈবিকরতিক্রিয়াশীল দুটি শরীরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, অনেক পরে, তাদের মনের মধ্যে। মনে রাখতে হবে সব রতিক্রিয়াই মাতৃত্বে বা পিতৃত্বে নির্দেশিত নয়।

দেহজ কাম ক্রিয়া যদি সুখদায়ক হয়ে থাকে তবেই সেখানে প্রেমের জন্ম হয়। শরীর জুড়োলে মন শীতল। আর শান্ত মনেই প্রেমের উত্তাপ অনুভব করা যায়। দেহের চৌকাঠ না মাড়িয়ে কি মনের মন্দিরের আঙিনায় পা রাখা যায়? বিষয়টি আদৌ জটিল নয় যদি সততার সাথে ব্যাপারটাকে দেখা যায়। ভাবা যাক কোনও পুরুষ বা নারী বা কোনও যুবক বা যুবতী বাকোনও কিশোর বা কিশোরী বলছে "আমি খোলা আকাশের প্রেমে পড়েছি" কিম্বা "হে ঝড় আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্ক ভাগী"! বেশ হাস্যকর একটা ব্যাপার, না? ঠিক তাই। আকাশের বা ঝড়ের শরীর নেই। শরীরকে বাদ দিয়ে প্রেম আসেনা। কিন্তু প্রেমের জন্মের পর শরীরের সাক্ষাৎ কোনও ভূমিকা নাও থাকতে পারে। আবার থাকতেও পারে। প্রেম হল এক অনুভূতি যা পুরনো হলেই বেশি তীব্রতার সাথে অনুভূত হয়। দেহের আকর্ষিকাসক্তি যত কমে আসে ততই প্রেম বাড়ে। প্রেমের জন্ম হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে কিন্তু লাস্যকামের জন্ম এক পলকেই ঘটে। ২৩ থেকে ২৯ এর মধ্যে যারা বিয়ে বা লিভ টুগেদার জনিত সহবাস করেন তাদের আচরণ ক্রিয়ার যদি একটা ধারারেখা টানা যায় তবে দেখা যাবে - প্রথম বছর winkly অর্থাৎ চোখের পলক পড়তে না পড়তেই নারী ও পুরুষের দুই শরীরে সর্পিল অনুরণন আর বন্যসুন্দরতার বল্গাহীন বহতা। মানে সকাল, দুপুর বিকেল, রাত্রি বা ঊষাকাল - এনি টাইম ইজ লাস্যকাম টাইম। কিম্বা আসরে, বাসরে, স্নান ঘরে, পাকশালে, টাকশালে, ভূমিতে, জমিতে, মেঝেতে, মেজেতে, আসনে, বাহনে সর্বত্র দুই শরীর নিমেষেই এক হয়ে যেতে পারে - এনি প্লেস ইস লাস্যকাম প্লেস। এর পরের কয়েক বছর weekly অর্থাৎ দোঁহে মিলি শনিবারের রাতে শুক্রদেবের আরাধনা। বংশ রক্ষা করতে হবে তো! অবশ্য বংশ রক্ষা হয়ে যাবার পরও লাস্যকামের মেল ট্রেন থামেনা, থামতে চায়না, তবে ওই সাপ্তাহীকি - দোঁহে বলে চল মন দেহের বাগানে বেড়াতে যাই। এই দীর্ঘ সময় ধরে কেবল লাস্যের বীজ বপন করা হতে থাকে আর এখানে প্রেমের কোনও লেশ মাত্র খুঁজে পেতে হলে এরকুল পোয়ারোঁ হয়ে প্রত্যেকটি নারী পুরুষের মধ্যে আসন পাততে হবে। অসম্ভব। এই লাস্যকামের খেলা চলে আরও বেশ কয়েক বছর। এরও বেশ কিছু বছর পর সাপ্তাহিক মেল ট্রেনের গতি কমে। শরীর তখন ক্যাঁচর কোঁচর করা শুরু করে দিয়েছে। খালি দৌড় করালে হবে? শরীর

বিদ্রোহ করে - হয় দেবীর নয় তো দেবার! তখন ঠিক নেই কিছুর। দেহের বাগানে মালী আসেনি অনেকদিন। জল পড়েনি। ধুলো পড়ে জমে আছে। মাঝে সাঝে এই সময়টা দিয়ে সাংসারিক শান্তি ও স্বস্তি দুই উপাদানের একটু বাহুল্য হলে তবে মন যায় লাস্যকামের বাগানে কিন্তু ওকেলয় অর্থাৎ দুর্বল বটে তব অঙ্গদখানি সচেষ্ট ইচ্ছাতারা খচিত। এইখানে এসে দেখা যায় কোথা দিয়ে যে দশটা বা পনেরটা বা কুড়িটা বছর কেটে গেছে দুজনের কেউই বুঝতে পারেনি। কত সুখ, কত অভিমানের সম্পদ নিয়ে দুজনে আজও দুজনার। দুজনেই বিশ্বাসের সরু সুতোর ওপর দিয়ে সটান হেঁটে চলেছে। সে তাঁরা প্রোষিতভতৃকাই হোক বা প্রোষিতভর্তকই হন - কোথায় যেন এক বাঁধন তৈরী হয়ে গেছে। সে বাঁধনকে দুজনারই অটুট মনে হয়। সে বাঁধনের মধ্যে এক অহঙ্কার আছে। সে বাঁধনের মধ্যে ত্যাগ আছে। সে বাঁধনের মধ্যে সহনশীলতা আছে, দায়িত্ববোধ আছে, শ্রদ্ধা আছে আর আছে দুজনের দুজনকে আর নিবিড় ভাবে জানার। এই খানে এসে লাস্যকামের সেই অঙ্কুরিত বীজ যা দেহের বাগানে বপন করা হয়েছে বিগত বছর গুলি ধরে তা পরিণত হয় প্রেমে। এই অঙ্কুর হল প্রেম। এইখানে এসে প্রেমের জন্ম হল অর্থাৎ Love. Lust এর সংগে Love অবস্থানগত ও সময়গত পার্থক্য আছে। দু'টোকে গুলিয়ে ফেললে চলবেনা। প্রেম চিরন্তন আর লাস্যকাম ক্ষণস্থায়ী। লাস্যকাম যদি বীজ হয় প্রেম তবে অঙ্কুরিত চারাগাছ বা আরও পরে প্রেমের মহীরুহ। এটা উপলব্ধি। তর্কের সামগ্রী নয়। প্রেম দেহের বাগানে পোঁতা সেই ফুলের চারা যার সুগন্ধ মনের ভেতর এক পাকাপাকি জায়গা করে নেয় দীর্ঘ পথ দেহের বাগানে একসাথে ঘোরাফেরা করার পরে। এই হল প্রেম। আবারও বলি এই লেখা তর্কের সামগ্রী নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

এক লম্বা জৈব দৌড়ের শেষে দেহ প্রশ্ন করে মনকে। তুমি আগে না আমি আগে? দেহ উত্তর পায় বা পায়না। মন প্রশ্ন করে আত্মাকে। তুমি আগে না আমি আগে? উত্তর পায়না তা নয় তবে মন চঞ্চলা তাই আত্মা উত্তর দেবার আগেই সে চলে যায় আরেক কাজে। আত্মার কোনও প্রশ্ন নেই কারণ আত্মা সব জানে। তাই মহা আত্মায় বিলীন হওয়া পর্যন্ত মনকে খুঁজতে হয় দেহ আগে না মন? প্রেম দেহে না মনে? নিরন্তর এই খোঁজ চলতেই থাকে আর আমরা গড়পড়তা সত্তর বছর বেঁচে নিই। দেহ বেচারা কলুর বলদ। দেহের গাড়ীটাকে টানতে টানতে শেষ পর্যন্ত যেতে হয় তাকে। কিন্তু বোধের গভীরে মন জানে দেহ একটা বাহন। বাহনে কেউ বাসা বাঁধেনা। বাসা বাঁধে ঘরে। আর সেই ঘর হল মন। প্রেম দেহে নয়। প্রেম মনে।

মুম্বাই
নভেম্বর ৬, ২০০৬

সূচীপত্র

মুখ্যমন্ত্রী শুনছেন কি?

ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর নিয়ে কিছু প্রশ্ন

অবহেলিত পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের গরুর গাড়ির চাকায় রোলসের এঞ্জিনের গতি আসছে, না কি এসে গেছে! কলকাতায় পা রাখলেই চতুর্দিক থেকে সবাক হোর্ডিং গুলো জেগে উঠে গান গায় আমার মনের মধ্যে - পশ্চিম বঙ্গে শিল্প বিপ্লবের নবজন্ম হয়েছে বা হচ্ছে। বেশ খুশী খুশী লাগে। পুলকিত হই। চারি দিকে একটা বেশ সাঁজ-সাজ রব। ভাল লাগে। চারিদিক থেকে বিদেশী পূঁজি আসছে, এসে গেছে, স্বপ্ন জেগে উঠছে, উঠেছে, মহা আশ্বাসের প্রবল নিশ্বাসের দুর্দমনীয় গতির সামনে সব চক্রান্ত, বাধা, বিপত্তি ও বিঘ্নকে উঠে দাঁড়াতে হবেনা আর! তা বেশ! ভাবতে ভাল লাগে, 'নবদিনমনি উদিবে আবার এই পুরাতন পুরবে' অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে। কত কি নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে বা উঠবে। ব্র্যান্ড বুদ্ধ (বিমান বাবু বা বিনয় বাবু মাফ করবেন) সত্যি এক শিল্প বিপ্লবের ঝড় আনতে সক্ষম হলেন, এটা আমার মত পশ্চিম বঙ্গ প্রেমিকের কাছে এক বিরাট আশার কথা।

কিন্তু আমি না কেমন যেন ঘোলাটে মেরে যাই যখন সব এই শিল্প বিপ্লবের বরমালার পুঁথি গুলোকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে চাই, যাতে আমার বুদ্ধি দিয়ে আমি আমার সাধের বাংলাকে আবার গরবিনী রূপে দেখতে পাই! কিছুতেই পরিস্কার করে দেখতে পাই না ঠিক কি হলো এই গত চার পাঁচ বছরের শিল্পের প্রসার ঘটানোর প্রচারের পর? খবরের কাগজে, চারি দিকে তো কেবল বেকারি, মাস্তানি, খুন, ছিনতাই আর অনেক রকমের পুঁজিহীন মাফিয়াদের কর্মকান্ডের পুঁজ রক্তে ভরা কৃতির বিজ্ঞাপন। তাহলে হলো টা কি?

ব্যাপারটা কি এরকম, কোন ও পুঁজি পতি তার বাড়তি পুঁজির ঝুলি নিয়ে লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে সদর্পে আসবেন। লাল বাড়ির বিশেষ কামরায় মিডিয়ার চোখ ঝলসানো ক্যামেরার সামনে করমর্দন করবেন। দীর্ঘ সময়ের নীরবতা পালন করবেন কেননা এদিক ওদিকে উঁকি মেরে দেখা একটা বেনিয়া অভ্যাস। অন্য কোথা, অন্য কোন ও খানে যদি আর ও বেশি পাওয়া যায় তাহলে এক লহমায় জানিয়ে দেওয়া যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি সুবিধা অন্য কোন ও রাজ্য দিচ্ছে। বাই বাই ওয়েস্টবেঙ্গল! এরকম ও তো শুনতে পাই, যে অমুকের প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ চলে গেল পশ্চিমবঙ্গ থেকে অমুক রাজ্যে। অজ্ঞতা ক্ষমার্হ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড আছে। সেই বোর্ডে অনেক হোমড়া চোমড়া আমলা, অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞেরা আছেন। তাদের কি কোন ও ব্লু-প্রিন্ট আছে?

পশ্চিমবঙ্গে কোন শিল্পে বিনিয়োগ হলে সব দিক থেকে ভাল হতে পারে! কোন শিল্প গুলোকে একটু সাহায্য করলে তাড়াতাড়ি সেগুলো বেড়ে উঠতে পারে! তার কোন ও জার্নাল বা খতিয়ান কি আছে, তাঁদের কাছে? প্রাজ্ঞজনের সমাহার ঘটে নিরুপম বুদ্ধত্বের মেধা যখন খুলিমুদ্দিনের আকাশে সূর্যের আলোয় বিমান যাত্রা করে। তাঁরা কি শুধুই, বিনিয়োগ আসছে, এসেছে, এসে গেছে বা এই এল বলে এই সব বলেই তাদের দায়িত্ব পালন করবেন? সাধারণ মানুষের কি এটা জানার অধিকার নেই যে কবে, কি ভাবে কারা এই বিনিয়োগের সুফল পাবেন!

প্রসঙ্গান্তরে বলি, ভেষজ ও ওষুধ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল এই পশ্চিম বঙ্গে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বিদগ্ধ নেতৃত্বে এই গোড়াপত্তন হয়েছিল মানিকতলার বেঙ্গল কেমিক্যাল এর জন্মলগ্নে। তাঁর অবর্তমানে ও, দীর্ঘ দিন সেই নেতৃত্ব পশ্চিম বঙ্গের হাতেই ছিল। কিন্তু ভেষজ ও ওষুধ শিল্পের বিকাশের জন্য কিছু মাত্র করা হয়নি ষাটের দশক বা সত্তরের দশকে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা

প্রবাদ পুরুষ বিধান রায় থেকে কিম্বদন্তি জ্যোতি বসুর সরকারের কখন ও মনে হয়নি যে স্বল্প বিনিয়োগে এই সংবেদনশীল শিল্পের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা রয়ে গেছে বা আজ ও আছে! পশ্চিমবঙ্গের অনেক পরে শুরু করে মহারাষ্ট্র বা অন্ধ্র প্রদেশ বা গুজরাত কি দ্রুত গতিতে ভেষজ ও ওষুধ শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে ফেলল। আমরা দেখতে থাকলাম। দেখতেই থাকলাম। নীরব দর্শকের ভুমিকায় পশ্চিমবঙ্গ - মহারাষ্ট্রের ও গুজরাতের 'ফিনিশড প্রডাক্ট' বা অন্ধ্রের 'র মেটিরিয়ালস' এর প্রগতির ধ্বজা উড়তে দেখতে থাকলো। তার মানে এই নয় মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে 'র মেটিরিয়ালস' বা অন্ধ্রে 'ফিনিশড প্রডাক্ট'এর বিকাশ ঘটেনি।

মুখ্যতঃ এই তিনটি রাজ্য সারা পৃথিবীতে আজ পরিচিত আর হ্যাঁ তার সাথে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসটাও 'ফারমা ইন্ডাস্ট্রি-রকাইভ' এ আছে। আজ শুনি পশ্চিমবঙ্গের কল্যানীতে বা কলকাতার আশেপাশে অনেক ওষুধ কম্পানী আছে। কি ভাবে আছে সেই কম্পানীগুলো? তালা বন্ধ। কোন ও প্রকারে শ্বাসটা চালু আছে। বা বলা যায় অমুক কম্পানীর মালীক হন্ডা একর্ড চড়ে ঘোরেন। আর হ্যাঁ, কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি পড়ানোর মান নিয়ে দেশে ও বিদেশে বেশ সুনাম আছে। যাদবপুরের ছেলে মেয়েরা কলকাতার বাইরে গিয়ে বড় বড় ফার্মা কম্পানী'র ভবিষ্যত গড়ছে আর আমরা নতুন পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন বিক্রি করছি লাল বাড়ির তখৎ-এ-তাজ এ বসে। এই শিল্পের ভবিষ্যত যে সবথেকে উজ্জ্বল সেটা জানতে কোন ও বিশেষ মস্তিস্কের প্রয়োজন হয়না। খবরের কাগজ খুললেই জানা যায়। আই টি ইন্ডাস্ট্রির থেকেও বেশি ধ্বনাত্মক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে ভেষজ ও ওষুধ শিল্পের মধ্যে। আমেরিকা বা ইউরোপের বা আফ্রিকার কোন ও শহরে গিয়ে যদি বলেন আপনি 'ইন্ডিয়ান ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত তাহলে দেখবেন আপনাকে কি সমাদর করা হয়। আজ ভারতীয় কম্পানী গুলো কি ভাবে সেই সব দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে তা পরিসংখ্যান বলে দেবে। আমরা এখান থেকে সারা পৃথবীর বাজারের প্রসারে প্রভাব ফেলতে পারি কিন্তু আমাদের নিজের রাজ্যেই শোনবার কেউ নেই! কিন্তু কি লাভ এ সব কথা বলে?

পাঠক যদি সাদা মনে পড়েন তো একটা ঘটনা এখানে বলি। আমি এই ভেষজ ও ওষুধ শিল্পের সাথে গত ৩০ বছর ধরে যুক্ত। ভেষজ ও ওষুধ শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়েই আমার কাজ তবে আমাকে তা করতে হয় সুদুর মুম্বাইতে, কলকাতায় নয়। কারণ? এতক্ষণে তা বোধ করি আপনারা বুঝে গেছেন। কিন্তু ওই যে মাটির টান! তাই ২০০২-০৩ নাগাদ আমি আমার বেশ বড় একটা পাকা চাকরী ও তার বেশভুষা ত্যাগ করে কলকাতায় গিয়েছিলাম একটা কিছু করবো বলে। তার ও ছ'মাস আগে থেকে আমি লাল বাড়ির সব মন্ত্রীদের কে সবিনয়ে আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে ই-মেইল করেছি বেশ কয়েক বার। কোন ও উত্তর পাইনি। তখন ও ঠিক ই-মেইল ব্যাপার টা আয়ত্ত হোয়ে ওঠেনি (আজ ও কি হয়েছে?) তাই আমার বিবেচনা ও বোধ আমায় আর ও জেদী ও আশাবাদী করে তুলল। আমি কলকাতায় গিয়ে লাল বাড়ির সঠিক ঘরটায় ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমার কোন ও দাদা বা মামা কোন ও রং এর সাথে সম্বন্ধ রাখেন না। অগত্যা আমার চেষ্টা প্রায় যখন বিফল তখন একদিন লাল বাড়ির এক মাঝারী আমলার কাছ থেকে একটা ফোন পাই। ফোন পেয়ে যাই সেখানে পরের দিন। গিয়ে আড়াই ঘন্টা বসে থাকি। তিনি চার হাতে আটটা ফোন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন আর আমি গলা শুকিয়ে কাঠ অবস্থায় বসে আছি। শেষে উনি আমাকে নিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কি কি ভাবে আমি কিছু করতে পারবনা পশ্চিমবঙ্গে। আমি চেয়ে ছিলাম যদি কোন ও একটা বন্ধ ওষুধ কম্পানীকে চালান যায়, তাকে লাভের মুখ দেখান যায় আর বেশ কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে একটা নতুন দিনের শুরু হতে পারে। আমি সেটা এখন ও চাই। আশা ছাড়িনি। কিন্তু সে পথে এত জটিলতা যে ভয় হয় পারবো তো কিছু করতে এই বাংলার মাটীতে যেখান থেকে আমার কর্ম জীবনের শুরু। আজ ও অনেক প্রস্তাব বিদেশ থেকে আসে কিন্তু তারা চান যে আমি কলকাতার বাইরে কিছু করি। কিন্তু কেন এই দ্যোতনা! এক দিকে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন যে আসুন কলকাতায়, সবাই আসছে আর অন্য দিকে বুনিয়াদী ব্যাপার গুলোই পায়ের তলায় জমি পাবেনা! এটা কি করে সম্ভব! আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু ভিন্নমত পড়েন কিনা জানিনা।

তবে যদি কখন ও এই লেখা পড়েন তবে তাঁর কাছে কয়েকটা প্রস্তাব রাখছিঃ

- ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে একটু নজর দিন। স্বল্প পুঁজিতে অনেক কিছু করা যাবে। অনেক ভাল ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে এর মধ্যে।
- আর যদি তা করেন তবে আমলা তন্ত্রের ফাঁস আর দলীয় লতাপাতার বাধন টাকে আলগা করুন বা একেবারে সরিয়ে রাখুন।
- বন্ধ ওষুধ কম্পানী গুলোকে কি ভাবে খোলা যায় তার জন্যে সঠিক 'প্রফেশনাল' দের সাথে সরাসরি কথা বলুন।
- পশ্চিমবঙ্গ থেকে রপ্তানী করার সমুহ সম্ভাবনা আছে। স্থানীয় বাজারেও অনেক ভাল বানিজ্য করার উপায় আছে। সেই সব তথ্য যথা সময়ে পাওয়া যেতে পারে।

- ফার্মা সেক্টরের 'ট্রেনিং নীড' কলকাতা থেকে পুরণ করা যেতে পারে। অপার সম্ভাবনা আছে এই ব্যাপারে।
- কোন ও রকম রাজনৈতীক প্রভাবহীন একটা ফার্মা বিসনেস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরী করুন, 'প্রফেশনাল' দের নিয়ে।

বাঙালীদের অনেকেই ফার্মা বিসনেস ওয়ার্লডে প্রতিষ্ঠিত আর তাঁরা ও কিছু করতে চান তাঁদের নিজের রাজ্যের জন্যে। এত কথা। এত সম্ভাবনা। অনেক কাজের হাতের দরকার হবে। একটু সংবেদনশীলতার সাথে বুদ্ধবাবু যদি একটু সময় দিয়ে শোনেন তাহলে ভেষজ ও ওষুধ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের আবার সুদিন আসবে। ভুলবেননা এখান থেকেই শুরু হোয়েছিল এই জয়যাত্রার। মুখ্যমন্ত্রী শুনছেন কি?

মুম্বাই
অগাষ্ট ২৭, ২০০৬

সূচীপত্র

বন্দেঃ মাতরম এর ওপর ফতোয়া

মায়ের পুজো করি। মাকে বন্দনা করি। মাকে ভাল বাসি। মা হোলেন গিয়ে শেষ আশ্রয়। বিপদে পড়লে মাকে ডাকি। কষ্ট পেলে বলি - মা, মা, মাগো রক্ষা করো। এ শুধু এই বিশাল দেশ ভারতে নয় আমার মনে হয় সারা বিশ্বেই মা এক কনসেপ্ট যাকে নিয়ে কোন ও বিবাদ বা মতবাদ থাকতে পারে না। যদি থাকে তবে তা বেশ কষ্টের। দেশমাতৃকা ও এক কনসেপ্ট যা, ধর্ম, জাত- পাত ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগের উর্দ্ধে।

ফতোয়া জারী হয়েছে স্কুলে বন্দেঃ মাতরম গান গাওয়া চলবেনা। নাঃ ঠিক তা নয়! সেটা হলে তাও একটা স্বস্তি থাকত। একটা সমবেত আওয়াজ তোলা যেত সেই ফতোয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু এ যে এক ভীষণ কঠিন সময় এল। এই সময় ও দেখতে হচ্ছে যে মায়ের বন্দনা করতে গেলে আগে দেখতে হবে যারা এই বন্দনা গান গাইছে তাদের ধর্ম কি! কারণ ফতোয়া জারী হয়েছে যে স্কুল গুলোতে মুসলীম ছাত্রদের যেন 'বন্দেঃ মাতরম' গাইতে বাধ্য না করা হয়। আজ হায়দ্রাবাদে হয়েছে, কাল অন্যত্র কোথায় ও এই রকম ফতোয়া জারী হয়ে যাবে। আমি ও একই সুরে বলি কাউকেই কিছু করতে বাধ্য করা উচিৎ নয়। ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তীতা একটা স্বেচ্ছা বরণীয় অভ্যাস। তার বাইরে কাউকে কিছু করতে বাধ্য করার আমি ঘোরতর বিরোধী। তাই হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন মৌলবী মস্তিস্কে বিরোধের আগুন জাজ্জ্বল্যমান। বন্ধ কর স্কুলের শুরুতে এই মাতৃবন্দনা - বন্দেঃ মাতরম। ছাত্র ছাত্রীদের বাবা মা' দের বলা হয়েছে তাঁদের সন্তান কে সেই স্কুল তেকে অন্যত্র মানে অন্য কোন স্কুলে নিয়ে যেতে যেখানে বিদ্যাভ্যাসের আগে মাতৃ বন্দনা হয়না। বেশ ভাল কথা। বেশ সুচিন্তিত পরামর্শ, থুড়ি ফতোয়া। ইসলাম বিরোধী কাজ করতে সব মুসলমান কে ফতোয়া জারী করেছেন বিভিন্ন ইসলাম শাখার ধর্মীয় নেতারা - মানে হায়দ্রাবাদের মৌলবীরা। ইসলামে মাতৃ বন্দনা শখৎ মানা। তাই কি?

আমি কিন্তু তাদের দলে নই যারা বলেন যে, এ দেশে থাকতে গেলে এদেশের কায়দা কানুন মেনেই চলতে হবে। যেটা ইসলাম দেশ গুলোতে বেশ প্রকট করে দেওয়া হয় অ-ইসলামী নাগরিক দের কাছে। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লেগেছে। যাদের নিয়ে এই ফতোয়া জারী করা হল সেই ছাত্র ছাত্রী দের মা বাবা দের কাছে কেউ কি জানতে চেয়েছে যে তাঁদের সন্তানেরা স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের আগে মাতৃ বন্দনা করে কষ্টে আছে না ভাল আছে? কেউ কি সেই সব ছাত্রদের একবার জিজ্ঞাসা করবে যে ওরা বন্দেঃ মাতরম এর মধ্যে দিয়ে মাতৃ বন্দনার গুঢ় অর্থ জেনেই এই গান গাইছিল এত দিন ধরে, নাকি ওদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বন্দেঃ মাতরম গান।

হায় রে দেশ আমার। ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র যদি জানতেন যে বন্দেঃ মাতরম গানের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করলে ফতোয়ার সম্মুখীন হতে হবে তাহলে উনি নির্ঘাৎ এই বন্দনা গান লেখা থেকে বিরত থাকতেন যতই তার চিত্ত তাঁকে মাতৃ বন্দনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকুক না কেন!

একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ মৌলবী সাহেবদের কাছে - ছোট ছোট শিশুদের সামনে হেসে হেসে কয়েকটা প্রশ্ন রাখুনঃ

১। আচ্ছা তোমার মাকে তুমি ভাল বাস?

২। আচ্ছা তোমার মায়ের সুখ্যাতি হলে তোমার ভাল লাগে?

৩। তুমি কি আল্লাহ তালার কাছে তোমার মা এর মঙ্গল কামনা কর?

৪। তোমার দেশ কে তুমি নিজের মায়ের মতই ভাল বাস?

৫। তোমার কি মাতৃ বন্দনা করতে ভাল লাগে?

৬। তুমি বন্দেঃ মাতরম গানের মধ্যে যে বক্তব্য আছে তা কি জান?

৭। সেই গানে যদি তোমার দেশমাতৃকার বন্দনা হয় তবে কি তুমি গাইবে সেই গান?

৮। তোমার কি বন্দেঃ মাতরম গান গাইতে ভাল লাগে?

যদি নির্ভয়ে শিশুরা তাদের মনের কথা বলতে পারে তবে হয়ত জানতে পারবেন যে বন্দেঃ মাতরম গানের মধ্যে দিয়ে ওদের দেশমাতৃকার বন্দনা করতে ভালই লাগে। আর তা যদি হয়, তবে দোহাই মৌলবী সাহেব এই শান্তির দেশ আজ অনেক অশান্তির মধ্যে আছে, আর নতুন করে অশান্তির বীজ বপন করবেন না।

বন্দেঃ মাতরম! বন্দেঃ মাতরম! বন্দেঃ মাতরম!
সুজলাং, সুফলয়াং মলয়াজ শীতলং,
শস্য শ্যামলাং মাতরম,
বন্দেঃ মাতরম!বন্দেঃ মাতরম!বন্দেঃ মাতরম!

আমি বিশ্বাস করি যে নিজের মাকে ভাল বাসে সে দেশমাতৃকার বন্দনা করার ওপর ফতোয়া জারী করতে পারেনা, তা সে যে ভাষাতেই গাওয়া হোকনা কেন।

কলকাতা
জুন ৮, ২০০৬

সূচীপত্র

কয়ামৎ সে কয়ামৎ

কয়ামৎ সে কয়ামৎ থেকে শুরু করে ফনা পর্যন্ত যে লম্বা সফর শ্রীমান আমীর খান বেশ সফলতার সঙ্গে চালিয়ে একটা বেশ মজবুত সামাজিক জমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন সে ব্যাপারে মিডিয়ার এখন ও সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু আমার নেই। লেখাটা এখান থেকেই শুরু করা যাক।

বেশ ছিলেন এই চল্লিশোর্ধ সদ্য বিবাহিত যুবক। জীবনে সাফল্য শুধু শরৎের খুশী খুশী সাদা মেঘের মত উড়ে বেরাচ্ছে। ফ্যান মহলে বেশ উঁচু দরের শিল্পী তিনি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর সবাই বেশ মান্নি গন্নি করে। লগান আর দিল চাহাতা হ্যায় এর পরে তো আমীর আন্তর্জাতিক তারা মহলের একজন হয়েছেন। মাঝে মঙ্গাল পান্ডে তত ব্যবসা না করলে ও ইমেজ টা তাঁর বেশ ভালোই তৈরী করে দিয়ে গেছে। এ' হেন আমীর খান হঠাৎ তাঁর সাম্প্রতীকতম কীর্তি 'ফনা' বাজারে আসার ঠিক আগে এই রকম একটা বোমা ফাটালেন কেন?এই কথাটা আমার মাথায় নড়াচড়া করছেঃ

আর তার জন্ম কিছু প্রশ্নেরঃ

১.কোথায় ছিলেন আমীর সাহেব যখন ভূপাল গ্যাস কান্ডের হত্যালীলা'র শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছিল আর আমেরিকা রাঘব বোয়াল উকীলেরা বেশ গুগলী দিয়ে নাস্তানাবুদ করছিল আমাদের সরকারি উকীল দের, ১০ বছর আগেও?

২. কোথায় ছিলেন এই সদা রোমান্টিক যুবক তারকা যখন কয়েক লক্ষ মানুষ গত ২০ বছরে নির্মম রেল দুর্ঘটনা গুলোতে বেঘোরে প্রাণ দেবার পর তাঁদের নিকটাত্মীয়দের হয়রানি হচ্ছিল কটা টাকা না পাওয়ার জন্যে? তাঁর সূর্য তো মধ্যাকাশে আজ প্রায় ২০ বছর ধরে! তাই না?

৩. কোথায় ছিলেন লগানের সেই ভুবন যখন গুজরাতের ভূমিকম্পের পর রিলিফের কাজে অনেক অনিয়ম হচ্ছিল? এখন ও অনেক ন্যায্য দাবীর মীমাংসা হয়নি। জানেন কি আমীর ভুবন খান?

৪. কোথায় ছিলেন "দিল চাহাতা হ্যায়" এর দিলদার বন্ধু যখন মুম্বাই শহরের বুকে পুলিশ দিন দুপুরে নিজের কর্ম ক্ষেত্রে ধরে এনে ধষর্ণ করেছিল? বেশ কয়েকটা এই রকম ঘটনা ঘটেছিল এই মুম্বাই শহরেই সেই দিন গুলোতে। ন্যায় ধর্মের প্রবল পরাকাষ্ঠা আমীর খান সাহেব কি সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন?

৫. হালের সুনামির কথা যদি তুলি যাতে এখন ও অনেক অনাথ মানুষ দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটু সুবিচারের আশায়! সেখানে আমীর খানের নজর পরেনি?

৬. খুব তাজা একটা ব্যাপার হলো সংরক্ষণ যার জন্য সারা দেশ জুড়ে প্রধাণতঃ ডাক্তারী ছাত্ররা আন্দোলন চালাচ্ছেন। সেখানে ও কি আমীরের নজর পরেনি?

৭. দা ভিঞ্চি কোড নিয়ে ও বেশ জল ঘোলা হোচ্ছে কিন্তু আমীর একজন আন্তর্জাতিক স্তরের তারকা হয়ে ও মুখ খোলেন নি! কেন?

৮. এই মুম্বাই শহরের প্রায় এক লক্ষ বার বালা দের, বেশ সংগঠিত ভাবেই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা আর ও পরিষ্কার করে দেখলে বলা যায় তাদেরকে বেশ্যা বৃত্তি'র দিকে ঠেলে দেওয়া হল । আমীর বাবু কি জানেন না সে সব? না আমি একথা বলছিনা যে আমীর কে বা কোন তারকাকে সব ব্যাপারেই শহীদ ক্ষুদীরাম হয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু সেটা যখন কেউ করবে তখন জনমানস তাকে পরিষ্কার ভাবে গ্রহণ করবে বা সমর্থন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ তার প্রচেষ্টার মধ্যে কোন বেনিয়াপনা নেই এই ধারণাই সাধারণ মানুষ করবে। নর্মদা বাঁধ নিয়ে বচসা চলছে প্রায় এক যুগ ধরে। আমীর কি খুব ব্যস্ত ছিলেন? জন সমর্থনের দই "আমীর-ফনা-নর্মদা" মিষ্টান্ন ভান্ডারে এখন ও জমেনি। তাই বলে জাত ভাই দের (ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর সভ্যরা) কেন এত সময় লাগছে ঠিক করে উঠতে যে "সঙ্গে যাই না চুপ মেরে যাই'? আমীর নিজের জমিতেই অনেক দিন ধরে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন বেশ আশাহীন ভাবে। অবশ্য টিভি চ্যানেলে বেশ ভাল আমীর পরিক্রমা হয়েছে। এত গুলো সমাজ শুধারকের ভুমিকায় 'লাইভ' অভিনয় করার সুযোগ ছিল কিন্তু আমীর মুখ খোলেননি। কেননা তখন সময়টা সঠীক ও উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। কিসের জন্যে? তা ও কি বলে দিতে হবে বুদ্ধিমান পাঠককে! মনে রাখতে হবে যে অপরাহ্নের সূর্যের তাপ কম আর তাঁর আলোতে যে ছায়া পড়ে সেটা বেশ লম্বা ছায়া। লম্বা ছায়া সাবধান করে দেয় জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছে যাওয়া সব মানুষকে!

তারকাদের একটু বেশি সাবধান হতে হয়। প্রত্যেক মানুষই জীবনের সব খেলাতেই জিততে চায়। তাতে কিছু অন্যায় নেই। তারকাদের জীবনে অপরাহ্ন এলে তারা সবাই বাজী মারতে চাইলেও খেলাটা এত ভাল খেলতে পারেন না। যেটা আমীর পেরেছেন বেশ ভাল ভাবেই। যশ চোপড়াজি একটু ধৈর্য ধরুন আপনার পুঁজি সমূলে ঘরে ফিরে আসবে। আর আমীর ভাই এবার একটু ভাবুন আগামী দিন গুলো নিয়ে। বেশ ভাল কিছু চরিত্র তৈরী করুন আর তার রসদ অনেক আছে। চাইলেই পাবেন।

সূচীপত্র

.....